ইজিপশিয়ান ট্রেজার

আবুল ফাতাহ

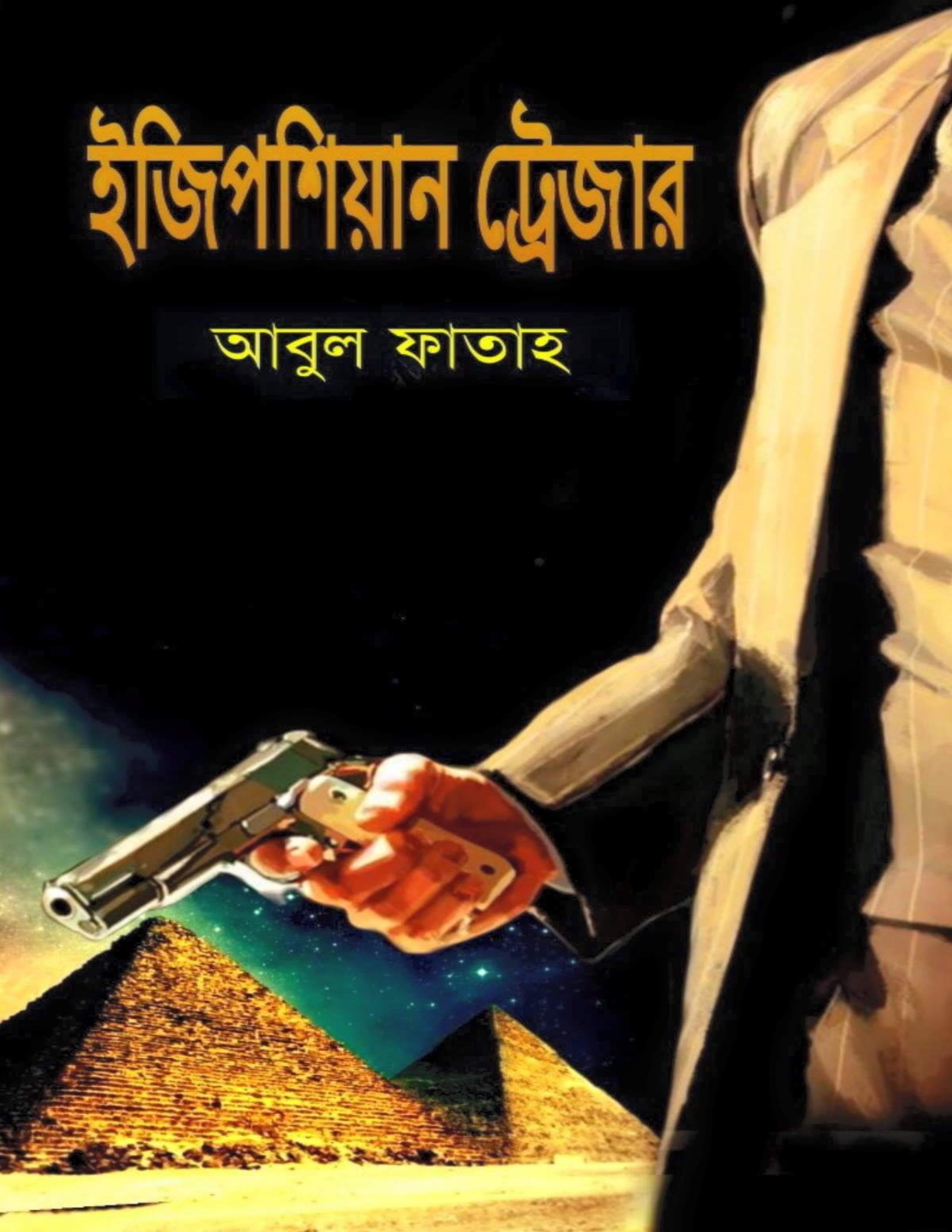

ইজিপশিয়ান ট্রেজার

স্পাই থ্রিলার

আবুল ফাতাহ

Ebook Created by: Bangla Epub & Mobi Creator Team (fb group)

কাহিনী সংক্ষেপঃ

বাংলাদেশ আর্মির সাবেক মেজর সাইফ হাসানকে সামান্য এক সূত্রের উপর ভরসা করে ছুটে যেতে হল মিশরে। এখানেই মরুভূমির ভেতর কোনো এক পিরামিডের অভ্যন্তরে এখনো লুকোনো আছে ফারাও এর গুপ্তধন!

মিশরীয় ললনা স্যুমাইয়াকে সাথে নিয়ে নেমে পড়ল গুপ্তধনের সন্ধানে। কিন্তু এর হদিস পেতে হলে সমাধান করতে হবে একাধিক জটিল ধাঁধার। ধাঁধার সমাধান করবে কি সাইফ, শুরু থেকেই পেছনে লেগে গেল রহস্যময় প্রতিদ্বন্দ্বী। সাইফ প্রতিপক্ষের পরিচয় যখন পেল, আক্ষরিক অর্থেই শিউরে উঠল। স্যুমাইয়াকে কিডন্যাপ করা হল। এই বিদেশবিভুইয়ে একা একা শক্তিধর প্রতিপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে সাইফ কি পারবে সাত রাজার অমুল্য ধন বাংলাদেশের নিয়ে আসতে।

এক

রাত দশটা।

গুলশানের একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল কালো রঙের একটি মার্সিডিজ। গাড়ি থেকে নামল দীর্ঘদেহী এক যুবক। সুদর্শন। উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের যুবকটির উচ্চতা ঝাড়া ছয়ফুট। পরনের কালো জিন্স আর সাদা টি-শার্ট চমৎকার মানিয়েছে তাকে। নাম সাইফ হাসান। এক সময় বাংলাদেশ আর্মির একজন মেজর ছিল। দুর্দান্ত সাহস আর দেশপ্রেম, প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস ওকে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সেই মেজরের আসনে বসিয়েছিল। ওর বাবা একজন নামকরা শিল্পপতি ছিলেন। স্বাভাবিক নিয়মে ওরও ব্যাবসায় নামার কথা, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই গায়ে জলপাই রঙ্গের ইউনিফর্ম চড়ানোর অদম্য ইচ্ছা তৈরি হয়েছিল ওর মধ্যে। এর পেছনে একজন মানুষের অবদান আছে। কর্ণেল আজহার চৌধুরী। ওর বাবার ঘনিষ্ট বন্ধু। প্রায়ই ওদের বাসাতে আসতেন তিনি এবং বেশিরিভাগ সময়ই ইউনিফর্ম পরেই। তখন থেকেই ইউনিফর্মটার প্রতি এক ধরনের ফ্যাসিনেশন তৈরি হয় সাইফের মধ্যে। তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিনেশনের জায়গায় স্থান করে নেয় অদম্য স্পৃহা। নিজের যোগ্যতায় আর্মিতে আসন বানিয়ে নেয় সাইফ।

তবে মেজর হবার কিছুদিন পরই লক্ষ্য করে, আর্মির কিছু পদস্থ অফিসার ডিফেন্স বিভাগের টপ সিক্রেট কিছু ইনফর্মেশন পাচার করছে পাশের দেশে। সাথে সাথে প্রতিবাদ করে বসে সাইফ। ফলাফল, চাকরিটা হারাতে হয় ওকে। চেষ্টা করলে হয়ত চাকরিটা বাঁচাতে পারত, কিন্তু এটাকে ও চাকরি হিসেবে

কখনই দেখেনি। রক্ষকই যেখানে ভক্ষক সেখানে নিজের দক্ষতা নিষ্ঠা আর ভালবাসা ঢেলে দেবার কোনো মানে খুঁজে পায়নি সাইফ। বলতে গেলে নিজেই একরকম ইস্তফা দিয়ে দেয়।

তবে সাইফ জন্মগতভাবে গোঁয়ার টাইপের! উঠে পড়ে লাগে এই কূচক্রের পেছনে। এবং এক পর্যায়ে সফলও হয় এদের মুখোশ খুলে দিতে। এই কাজেও ও সাহায্য পেয়েছিল কর্নেল আজহার চৌধুরীর। তিনি বর্তমানে রিটায়ার্ড। এই মুহূর্তে তাঁর কাছেই এসেছে ও। আজ সন্ধ্যায় হুট করেই তলব। এই মানুষটার যেকোনো আদেশই শিরোধার্য সাইফের কাছে।

গাড়ী থেকে নেমে সদর দরজার দিকে এগোলো সাইফ দৃঢ় পদক্ষেপে। দরজায় নক করতেই কর্নেল আজহার চৌধুরীর পরিচারক জাফর দরজা খুলে দিল। মধ্যবয়সী মানুষটা সাইফকে ভালমতই চেনে।

‘স্যার, আপনার জন্য দোতলায় অপেক্ষা করছে।’

কর্নেলের সাথে থাকতে থাকতে জাফরেরও ভূমিকাহীন কথা বলা অভ্যেস হয়ে গেছে। সাইফ মাথা ঝাঁকিয়ে দোতলার সিড়ির দিকে এগোলো। রুম চেনাই আছে।

মৃদু টোকা দিতেই ভেতর থেকে কর্নেলের কন্ঠ ভেসে এল, ‘কাম ইন।’

রুমে ঢুকেই অনেকটা হকচকিয়ে গেল সাইফ। কর্নেল যেন খাচায় বন্দি বাঘ একটা। অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন। আর্মি অফিসাররা বিচলিত হলে ধরে নিতে হবে ঘটনা গুরুতর।

‘কী খবর, মেজর?’ ক্ষণিকের জন্য থেমে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন কর্নেল। দীর্ঘদিনের সামরিক অভ্যেসে এখনো সাইফকে মেজর বলেই ডাকেন কর্নেল।

‘জী, স্যার ভাল।’ খানিক বিরতি দিয়ে বলল, ‘এনিথিং রং, স্যার?’

‘বোসো।’ বলে আবারও পায়চারী করতে লাগলেন কর্নেল।

সাইফ বসে বসে বাচ্চাদের মত ঘাড় ঘুরিয়ে রুমের আসবাবপত্র পর্যবেক্ষন করছিল, এমন সময় কর্নেলের আচমকা প্রশ্ন, 'নাসের বিন ইউসুফ নামটার সাথে কি তুমি পরিচিতি?'

'জী স্যার।' একমুহুর্ত না ভেবেই উত্তর দিল সাইফ। পরিচিত না হবার কোনো কারণ নেই। গত কয়েকদিন ধরে সারা বিশ্বেই নামটা খুবই আলোচিত। নাসের বিন ইউসুফ হলেন মিশরের একজন ধনকুবের। সপ্তাহখানেক আগে ভদ্রলোক মারা যান। মৃত্যুর আগে তিনি তার বিলিয়ন ডলারের সম্পত্তি দান করে যান একটা জনকল্যাণমূলক ট্রাস্টে। মৃত্যুর আগে যার নামও মানুষ শোনেনি, মৃত্যুর পর তিনিই হিরো বনে যান পৃথিবীর মানুষের কাছে।

'নাসের আমার বন্ধু ছিল।' কথাটা এমনভাবে বললেন কর্নেল, সাইফের কয়েকমুহুর্ত লেগে গেল কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে।

'কি করে, স্যার?'

'সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমি একবার সেনাবাহিনীর একটা টিমের সাথে তিনমাসের জন্য মিশর গিয়েছিলাম একটা ট্রেনিং-এ। অনেক বছর আগের কথা। সেখানেই নাসেরের সাথে পরিচয়। তখনও ও এতটা ধনী ছিল না। পৈত্রিক ব্যবসায় সবেমাত্র ঢুকেছে। কিভাবে কিভাবে যেন ওর সাথে আমার একটা বন্ধুত্ব হয়ে যায়। অবসরে প্রায়ই ওর বাড়িতে যেতাম। গল্প করতাম দুজনে মিলে। আমি দেশে ফিরে আসার পর নাসেরের বিয়েতে ওর আমন্ত্রণ রক্ষার জন্যই মিশর গিয়েছিলাম একবার। সেও অনেক আগের কথা। যোগাযোগে মাঝে মধ্যে ভাটা পড়লেও একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি কখনও।

আমি একবার কথায় কথায় আমার একটা গোপন স্বপ্নের কথা বলেছিলাম ওকে। আজ তোমাকে সেই স্বপ্নটার কথা বলার জন্যই ডেকেছি।

সাইফ যথেষ্ঠ অবাক হল। একজন মিশরীয় ধনকুবের আর কর্নেলের স্বপ্নের মধ্যে ওর ভূমিকাটা ঠিক কোথায়? চুপ করে রইল। খানিকবাদেই জানা যাবে।

‘একজন আর্মি অফিসার হিসেবে নিশ্চয়ই এসপিওনাজ সম্পর্কে ভাল ধারনা রাখো তুমি। সিআইএ, এমআইসিক্স, র, আইএসআই এদের ক্ষমতার কথাও অজানা নয় তোমার। অঘটনঘটন পটীয়সী এরা। বিশ্বের যেকোনো জায়গায় যেকোনো সময় যেকোনো ধরনের অঘটন ঘটানো এদের কাছে ডালভাত। বিশ্বের প্রায় সব পলিটিক্যাল মার্ডারের পেছনে এদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ হাত আছে। স্যুপার পাওয়ারগুলো মূলত চলছেই এসব এসপিওনাজ এজেন্সির কাধে ভর দিয়ে। এই সিক্রেট সার্ভিস না থাকলে মুখ থুবড়ে পড়বে তাদের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি আমাদের এই দেশ এখনো এসপিওনাজ জগতে হামাগুড়ি দিচ্ছে বললেও বেশি বলা হয়ে যাবে। তাদের সাথে টেক্কা দেয়া তো দুরে থাক, আমাদের আভন্তরীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও ডিজিএফআই, এনএসআই কিংবা সিআইডির পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর সত্যিকার অর্থে এগুলো এসপিওনাজ এজেন্সীও নয়। স্বীকার করছি, উন্নয়নশীল একটা দেশ হিসেবে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরকার চাইলেও বিভিন্ন কারনেই এ ধরনের সিক্রেট সার্ভিস চালু করা সম্ভব নয়। তবে কেউ যদি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ছদ্মাবরণে বাংলাদেশের হয়ে এসপিওনাজ কার্যক্রম পরিচালনা করে তবে কার কি বলার থাকতে পারে?’ শেষের কথাটা বলার সময় এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল কর্নেলের।

‘খুবই ভালো আইডিয়া। কিন্তু স্যার...।’

সাইফকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল। ‘জানি, কী বলবে। এতে কত বিপুল পরিমাণ টাকার প্রয়োজন সেটাই বলতে চাচ্ছো তো?’

সাইফ চুপ করে রইল। কর্নেল ওর প্রশ্নটা ধরতে পেররেছেন।

‘নাসের মারা যাবার পর আমার আমার অ্যাড্রেসে একটা মেইল আসে। নাসেরই পাঠিয়েছে।’

প্রশ্নটা হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে, এরপরও না করে পারল না সাইফ, ‘স্যার, মৃত্যুর

পর কিভাবে ইমেইল করলেন উনি?’

সাইফের বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন কর্নেল। ‘ও মৃত্যুর আগে একজনকে বলে গিয়েছিল। তার ব্যাপারে পরে জানতে পারবে। তো, সেই মেইলের মাধ্যমে আমি জানতে পারলাম, সেই কবে বলা আমার স্বপ্নের কথাটা নাসের আমৃত্যু মনে রেখেছিল। এবং শুধু মনেই রাখেনি, স্বপ্নটা বাস্তবায়নের পথও বাতলে দিয়ে গেছে। যদিও সেই পথটায় তোমাকেই হাঁটতে হবে।’

‘সরি, স্যার?’

কর্নেল কিছু না বলে একটা প্রিন্ট আউট বাড়িয়ে ধরলেন সাইফের দিকে। ‘পড়ে দেখো।’

সাইফ হাত বাড়িয়ে প্রিন্ট আউটটা নিয়ে পড়া শুরু করল।

“কর্নেল, কেমন আছো। আমার শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। ডাক্তাররা এক প্রকার আশা ছেড়েই দিয়েছে। লিভার প্রায় অকেজো। হয়ত আর কোনোদিন দেখা হবে না। কারণ, এই চিঠিটা যখন তুমি পড়বে, তখন ধরে নিয়ো আমি আর নেই। সেভাবেই বলে গেলাম, আমার ভাই, আমার বন্ধু শেইখ সালাহউদ্দিনকে। শেইখ সালাহউদ্দিন আমার দুঃসম্পর্কের ভাই। কিন্তু এতটা বছরে আমার আপন ভাইয়ের থেকেও আপন হয়ে গেছে। সালাহউদ্দিন আমার ম্যানেজারও।

তুমি তো জানো, আমার কোনো উত্তরাধিকার নেই। কোনো সন্তানও আল্লাহ আমাকে দেননি। এজন্য আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেলাম একটা ট্রাস্টিতে। তোমার মনে আছে, তুমি অনেক আগে আমাকে একটা স্বপ্নের কথা বলেছিলে? বলেছিলে, তোমার ছোট্ট দেশটার জন্য তুমি কিছু করতে চাও। কথাটা তখনই আমার বুকে গিয়ে লেগেছিল। আমি তোমার দেশ কখনো দেখিনি। কিন্তু তোমার মুখে শুনে শুনে, সত্যি বলতে আমি তোমাদের ছোট্ট, সবুজ দেশটার প্রেমে পড়ে গেলাম। সবসময়ই ইচ্ছা হত তোমার জন্য কিছু

করি। কিন্তু কাজটার ঝুঁকির কথা চিন্তা করেই বারবার ইতস্তত করেছি। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে আর ইতস্তত করার মানে হয় না। এখনও যদি কথাটা না জানাই তাহলে সারাজীবনের জন্যই হয়ত রহস্যটা মরুভূমির বালির নীচে চাপা পড়ে থাকবে।

যাইহোক, গোড়া থেকেই বলি। ছোটবেলা থেকেই আমি একটু বাউন্ডুলে টাইপের ছিলাম। মাঝে মধ্যেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম মরুভূমিতে। একা একাই ঘুরে বেড়াতাম। কখনো সন্ধ্যা, আবার কখনো গভীর রাতে বাড়ি ফিরতাম। আমরা এখনকার মত না হলেও পারিবারিকভাবেই ধনী ছিলাম। বাবা মারা যাবার আগ পর্যন্ত আমাকে ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি। সেজন্য এই ধরনের এডভেঞ্চার ঘন ঘনই হত।

এমনই একদিন আমার গাড়ি নিয়ে বের হয়ে পরলাম। সত্যি বলতে, মরুভূমির নিঃসঙ্গতা আমাকে চুম্বকের মত টানত। চারদিকের শুনশান নীরবতায় ঘোর লেগে যেত। মরুভূমিতে ঢুকলেই আমি যেন ঘোরের মধ্যে চলে যেতাম। মাঝে মধ্যেই খেয়াল রাখতে পারতাম না কোথায় যাচ্ছি। ঘোর কেটে গেলে কম্পাসের সাহায্য নিয়ে অনেক ঝক্কি সহ্য করে ফিরে আসতে হত। তো, সেদিনও গাড়ি চালাতে চালাতে আমি এক সময় লক্ষ্য করে দেখলাম, জায়গাটা সম্পুর্ন অপরিচিত ঠেকছে। এর আগে কখনো আমি আসিনি এখানে। ইতিউতি তাকিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করবার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার সিক্সথ সেন্স বলে দিল, সামনে বিপদ! ধেয়ে আসছে মরুভূমির আতঙ্ক সাইমুম। ভয়ঙ্কর এই বালু ঝড় আসে কোনো রকম আগাম আভাস না দিয়েই। এর স্থায়ীত্বেরও কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। কখনো কয়েক মিনিট আবার কখনো লাগাতার কয়েক ঘন্টা হওয়াও বিচিত্র না। খুব দ্রুত একটা আশ্রয় নিতে হবে। ঝড়ের ভয়াবহতা সম্পর্কে আগে থেকে আঁচ করা সম্ভব নয়। সাইমুম যখন বিদায় নেয়, তখন দেখা যায় এখানে ওখানে অনেক বালির ঢিবি গজিয়ে গেছে। কোনো কোনোটা ছোটখাট টিলার মত। এরকম একটা টিলা আমার মাথায় গজালে তো

মুশকিল!

আমার গাড়িটা ছিল একটা হুড খোলা ল্যান্ড রোভার। এটাকে আর যাই হোক, আশ্রয় ভাবার অবকাশ নেই। এদিক সেদিক তাকাতেই কিছুটা দূরে কতগুলো পাথরের স্তুপ দেখতে পেলাম। স্তুপের মধ্যেই একটা গর্ত মত জায়গা। গুহা ভেবে দৌড় দিলাম সেদিকে।

কাছাকাছি আসতেই লক্ষ্য করলাম, কিছু কিছু পাথরের আকৃতি অদ্ভুত। যেন যত্ন করে আকার দেয়া হয়েছে ওগুলোকে। হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে। এটা কোনো পাথরের স্তুপ নয়, একটা পিরামিডের ধ্বংসাবশেষ! স্তুপের গায়ের গর্তটা দেখতে দেখতেই আমি আরেকটা ব্যাপার বুঝে ফেললাম।

পিরামিডের ইতিহাস তো জানোই। প্রাচীন মিশরে উচ্চ শ্রেণীর মানুষ মারা গেলে পিরামিড তৈরি করে তাদের সমাহিত করা হত। সেই সাথে প্রচুর ধন সম্পদ, আর দাসদাসী মেরে দিয়ে দিত। অনেকেরই ধারনা, পিরামিডের ভেতরটা বোধহয় ফাঁপা। এর ভেতরই বোধহয় সমাধি আর ধন সম্পদ থাকে। তবে আসল ব্যাপারটা হল, পিরামিড একটা নিরেট জিনিস। লাশ কিংবা ধন সম্পদও এর ভেতরে থাকে না। পিরামিডের ঠিক নীচেই একটা চেম্বার থাকে। এখানেই থাকে সব। এই চেম্বারে প্রবেশে করতে হয় একটা টানেলের মাধ্যমে। আর এই টানেলের গোপন প্রবেশ মুখটা থাকে পিরামিড থেকে কয়েকশ গজ দূরে। গর্তটা দেখেই আমি বুঝতে পারলাম কিছুটা দূরেই যে পিরামিডের ধ্বংসস্তুপ দেখতে পাচ্ছি সেটারই প্রবেশ মুখ এই গর্ত। কত বছর আগে কে জানে, একটা ভয়াবহ ভূমিকম্পে পিরামিডটা ধ্বসে পড়েছে। এখন স্রেফ এলোমেলো কতগুলো পাথরের স্তুপে পরিণত হয়েছে। তবে ভূমিকম্প একটা উপকার করেছে। পিরামিডটার গোপন প্রবেশপথটা উন্মুক্ত করে দিয়ে গেছে। নইলে হয়ত কখনই বুঝতে পারতাম না, আমার পায়ের নীচেই লুকিয়ে আছে একটা পিরামিডের চেম্বার!

সাইমুম চলে এসেছে। এখানে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবার সময় নেই। তড়িঘড়ি করে আমি সুড়ঙ্গ দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলাম। টানেলের প্রবেশ মুখের ঠিক নীচেই ছোট্ট একটা চেম্বার। দশ বাই দশ ফুট। এটা মূল চেম্বার নয়। মূল চেম্বার আরো ভেতরে। একদিকের দেয়ালে একটা পাথুরে দরজা দেখা যাচ্ছে। গায়ে হিজিবিজি করে কি সব লেখা। অন্তত প্রথম দৃষ্টিতে সেরকমই মনে হয়। যদিও এগুলো আসলে হায়ারোগ্লিফিক। মিশরের বেশিরভাগ শিক্ষিত মানুষ কিছু কিছু হায়ারোগ্লিফিক জানে। আমিও এক কালে শিখেছিলাম। সেই অপূর্ন জ্ঞান দিয়ে দরজার গায়ে কথাগুলোর মানে বের করতে চাইলাম। ভাসা ভাসা বুঝলাম, আমাকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছে এখানে আসার জন্য! এগুলোই লেখা থাকে সব পিরামিডে। আমি লেখার পাঠোদ্ধার বাদ দিয়ে লুকনো লিভার খুঁজতে লাগলাম। জানি, এখানে একটা লুকনো লিভার থাকবে। ওটা দিয়েই এই দরজা খোলা সম্ভব। বেশ কিছুক্ষন পর দেয়ালের গায়ে একটা পাথরের ব্লক আবিষ্কার করলাম। অন্য ব্লকগুলো থেকে খানিকটা উচু। বিসমিল্লাহ বলে চাপ দিতেই যেন সাইমুম এই ছোট্ট চেম্বারটাতে ঢুকে পড়ল। ঘড়ঘড় শব্দ, সেই সাথে কাঁপুনি।

এক সময় সব থামল। দরজাটা খুলে গেছে। ভেতরটা কালিতে চোবানো। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। একটা লাইটার অবশ্য সাথে আছে। সেটা দিয়ে আর কতটুকু কী হবে? তবে বাইরে বোধহয় সাইমুম থেমে গেছে। সুরঙ্গ পথে আসা আলোর উজ্জ্বলতা বেড়ে গেছে। সেই আলোকে সম্বল করে আরেকবার আল্লাহর নাম নিয়ে আমি দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম।

কয়েক পা এগোতেই চোখে আলো সয়ে এল। বুঝতে পারলাম, আমি আরেকটা টানেলে চলে এসেছি। টানেলের শেষটা দেখা যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই বেশ বড় হবার কথা। শেষ মাথায় আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে তাও জানি না। এডভেঞ্চারের উন্মাদনায় শরীরের রোমকূপ দাঁড়িয়ে গেল।

কতটা দূর এলাম, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। যতই ভেতরে এসেছি ততই আঁধার বেড়ে গেছে। প্রবেশ পথটা যেন সুদূর অতীত। শুধু আলোর একটা বিন্দু

দেখা যাচ্ছে ফেলে আসা পথের মাথায়। আমি লাইটার জ্বাললাম। সামনে এখনো অনেকটা টানেল পড়ে রয়েছে। আরো খানিক এগিয়ে গেলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি আলোর সেই বিন্দুটাও অদৃশ্য হয়েছে। গা টা ছমছম করে উঠল। সহস্রাব্দ প্রাচীন এক পিরামিডের কালি গোলা আঁধারে নির্ভীক দাঁড়িয়ে থাকতে যতটা সাহসের প্রয়োজন হয়, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, অতটা সাহসী আমি কোনোকালেই ছিলাম না।

আবারও লাইটার জ্বাললাম। এবার দেখা গেল কয়েক হাত সামনেই হুবুহু আগের মত আরেকটা দরজা। কাছে গেলাম। কিছুটা আগের অভিজ্ঞতা থেকে হাতড়ে হাতড়ে আর কিছুটা লাইটারের দুর্বল আলোর সাহায্য নিয়ে বের করে ফেললাম লিভারটা।

চাপ দিতেই সেই পুনরাবৃত্তি। কিছুক্ষন ঘড় ঘড় শব্দ, এরপর খুলে গেল দরজাটা। আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। লাইটারের অপ্রতুল আলোতে বলতে গেলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এরপরও আঁচ করা যাচ্ছে এই চেম্বারটা বিশাল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলাম। আগুনের কাঁপাকাঁপা আলোয় সেই সময় অদ্ভুত ব্যাপারটা চোখে পড়ল। আমার কিছুটা সামনেই একটা উঁচু বেদীর মত জায়গায়। সেই বেদীটার উপর রাখা আছে একটা কফিন! সারকোফেগাস!

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতেই লাইটারের আলোর ব্যাপ্তি বেড়ে গেল। আমি আবারও অভিভূত হয়ে লক্ষ্য করলাম। উঁচু কফিনের দুপাশে আরো কয়েকটা কফিন রাখা আছে। এক, দুই, তিন... পাঁচটা! মোট পাঁচটা বাক্স।

মাঝের কফিনটাই শুধু উঁচু বেদীতে রাখা। বাকিগুলো খানিকটা নীচুতে। আমি সামান্য মাথা খাটাতেই ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম। এই সমাধি যার জন্য তৈরী করা হয়েছে, উঁচু কফিনটাতে রয়েছে তার মমি। আর বাকিগুলোতে... আমি আর আকাশ কুসুম ভাবতে চাইলাম না। হাত বাড়িয়ে একটা কফিনের ডালা

ধরলাম। দুরুদুর বুকে উঁচু করতে চাইলাম। বেশ ভারী। লাইটারটা বন্ধ করে দুই হাত লাগাতে হল। এক সময় খুলে ফেললাম ডালাটা। এরপর পকেট থেকে লাইটার বের করলাম। জ্বালবার আগে কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়েছিলাম নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে। লাইটার জ্বাললাম।

ওহ মাই গড, কর্নেল! কল্পনা করতে পারছ আমি কী দেখলাম?

পুরো সারকোফেগাস ভর্তি বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্যে!

একে একে বাকি তিনটা সারকোগফেগাসও খুলে দেখলাম, একই অবস্থা। স্বর্ণালংকার থেকে শুরু করে অমূল্য সব পাথর, কী নেই!

এরপরের কাহিনি সংক্ষিপ্ত। আমি ওখান থেকে চলে আসি। এর ক' দিন পরই বাবা মারা গেলেন। এরপর বাবার পুরো ব্যবসার হাল আমাকেই ধরতে হল। নিঃশ্বাস নেবার সময় পেতাম না। মাঝে মধ্যে মনে হত ওগুলো নিয়ে আসি। কিন্তু বললেই তো আনা যায় না। এটা একটা রহস্যই বটে, মরুভূমিতে ঘোরাঘুরির ফলে আমার ব্যাপারে বাজারে গুজব ছিল-আমি নাকি গুপ্তধন পেয়েছি। সেটা এভাবে সত্যি হবে ভাবিনি। আর ওই গুজবটার কারণেই এত বিপুল সম্পদ কারো চোখে না পড়ে খরচ করা কিংবা নিজের কাছে রাখা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার নিজের টাকা পয়সা নেহাত কম ছিল না। তাছাড়া আমার ধারণা ছিল, নিজের কাছে রাখার চাইতে ওই প্রাচীন পিরামিডেই ওগুলো নিরাপদ থাকবে বেশি। হাজার হাজার বছর ধরেও যখন সবার অলক্ষ্যেই থেকে গেছে তখন আরো অনেকগুলো বছর নিরাপদেই থাকবে-ভাবতে দোষ নেই। মাঝে মধ্যে আবার চিন্তা করতাম সরকারকে সব জানিয়ে দেই। কিন্তু এই চিন্তাটা কখনই খুব বেশিক্ষন স্থায়ী হত না। তুমি তো জানোই আমাদের দেশের শাষন ব্যবস্থার প্রতি আমার একদমই আস্থা নেই। হয়ত কিছু ট্রেজার মিউজিয়ামে রাখা হবে, বাকি সব বারো ভূতে লুটে পুটে খাবে। তার চাইতে ওখানেই থাক, কখনো প্রয়োজন পড়লে গিয়ে নিয়ে আসা যাবে। পিরামিডটাকে

ব্যাংকের সুরক্ষিত ভল্ট হিসেবে নিয়েছিলাম।

এভাবেই কেটে গেল আমার সারাটা জীবন। মরণব্যাধি লিভার ক্যান্সার এক ঝটকায় আমাকে পথের শেষ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এমন সময় তোমার সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। বুঝতে পারলাম, এখনই সময়। ট্রেজারগুলো নিজের কাছে এনে রাখতে হবে। এরপর সুযোগ বুঝে তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু আমি হতাশ হয়ে লক্ষ্য করলাম, আজ এত বছর পর পিরামিডটার অবস্থান আমি আর মনে করতে পারছি না!

অনেক চেষ্টার পর এলাকার একটা পজিশন আবছাভাবে ধারণা করতে পারলাম। আমি সেটা শেইখ সালাহউদ্দিনকে জানি গেলাম। যদিও নিশ্চিত নই অবস্থানটা পুরোপুরি সঠিক কিনা। তবে আরো কিছু ব্যাপার আছে, যেগুলো অনুসরণ করলে দুঃসাধ্য হলেও একেবারে অসম্ভব নয় সেই পিয়ামিড খুঁজে বের করা। তাছাড়া ট্রেজারগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য আমি কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি। সেজন্য আশা করি এখনো নিরাপদেই আছে ট্রেজারগুলো। তবে সেগুলো খুঁজে বের করতে হলে তীক্ষ্ণ মেধাবী আর পরিশ্রমী কাউকে প্রয়োজন হবে। এমন বিশ্বস্ত কেউ যদি তোমার কাছে থেকে থাকে তবে তাকে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি সালাহউদ্দিনকে সব বলে গেলাম, সে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

আর বেশি কিছু বলার নেই। এই মেইলটা লিখতে পরিশ্রমের চূড়ান্ত করতে হচ্ছে আমাকে। তোমার কাছে জীবনের শেষ অনুরোধ, ট্রেজারটা তুমি উদ্ধার করো।

-ইতি

নাসের বিন ইউসুফ

র্যামসিস, ইজিপ্ট

চিঠি থেকে চিন্তিত মুখে মাথা তুলতেই সাইফ দেখতে পেল ততোধিক চিন্তিত মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছেন কর্নেল আজহার চৌধুরী।

‘কী বুঝলে?’

‘অবিশ্বাস্য ব্যাপার, স্যার।’

‘হুম, তবে ঘটনা সত্য। আজ বিকেলে শেইখ সালাহউদ্দিন ফোন করেছিলেন। জানতে চাইলেন, কাউকে পাঠাচ্ছি কিনা। আমি কাল জানাব বলেছি।’

সাইফ মাথা নীচু করে ভাবতে লাগল। সাইফ স্পষ্টই বুঝতে পারছে কর্নেল কী বলতে চান। কাজটা ঝুঁকি আছে। মারাত্মক ঝুকি। একটা দেশ থেকে সে দেশের সম্পদ বলতে গেলে চুরি করে আনতে হবে। কতদিনের ধাক্কা কে জানে? তার চাইতে বড় প্রশ্ন আদৌ সেই ট্রেজার খুঁজে পাবে কিনা সেটারও নিশ্চয়তা নেই। নাসের বিন ইউস্থফ নিজেও নিশ্চিত নন জায়গাটার ব্যাপারে। আর পেলেও একেবারে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে দেশে নিয়ে আসবে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আনতে হবে সমুদ্রপথে। সবমিলিয়ে হয়ত প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করতে বলছেন কর্নেল।

তবে কর্নেলের স্বপ্নটা ওকে নাড়া দিয়ে গেছে। ও নিজেই তো কতদিন স্বপ্ন দেখত, বাংলাদেশের সিক্রেট সার্ভিসের হয়ে কাজ করবে। যদিও আর্মির ইন্টেলিজেন্স উইং এর হয়ে কিছুদিন কাজ করেছে কিন্তু সেটা আসলে এসপিওনাজের মধ্যে পড়ে না। আর বর্তমান বিশ্বে এসপিওনাজের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। ট্রেজারটা উদ্ধার করা গেলে সত্যি দেশের জন্য অনেক বড় একটা কাজ হবে। আর সবচাইতে বড় কথা, সামনে দাঁড়ানো এই মানুষটার কথা ও ফেলতে পারবে না।

সাইফ যখন মাথা তুলল, তখন ওর চোখে ইস্পাত কঠোর দৃঢ়তা দেখতে পেলেন কর্নেল।

‘কবে যেতে হবে স্যার?’

স্বস্তির নিঃশ্বাসটা গোপন করার কোনো চেষ্টাই করলেন না কর্নেল। ‘তোমার কাগজপত্র আমি তৈরি করে রেখেছি। আগামীকাল রাতেই তোমার ফ্লাইট।’

সাইফের মনে পড়ল তিন চারদিন আগে কর্নেল ওর পাসপোর্ট চেয়ে নিয়েছিলেন। বিস্মিত হয়ে সাইফ প্রশ্ন করল, ‘স্যার, আপনি জানতেন, আমি রাজি হব?’

স্মিত হেসে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল।

দুই

কাস্টমসের ঝামেলা শেষ করে ইমিগ্রেশন পার হতেই "সাইফ হাসান" লেখা বোর্ড নজরে এল সাইফের। প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক বোর্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়স পয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। হালকা পাতলা গরন। চেহারায় আভিজাত্য ফুটে আছে। কালো চুলে ছোপ ছোপ রুপালী আভা। কিছুদিনের মধ্যে পাঁক ধরবে, তারই পুর্বাভাস।

সাইফ এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল ভদ্রলোকের দিকে, 'সাইফ হাসান।'

'ওয়েলকাম টু ইজিপ্ট।' নিখাদ আন্তরিকতা ফুটে উঠল শেইখ সালাহউদ্দিনের হাসিমাখা মুখে। 'যাওয়া যাক তবে।'

পিঠে ঝোলানো বড়সড় ট্রাভেল ব্যাগ ছাড়া আর কোনো লাগেজ নেই সাইফের কাছে। শেইখ সালাহউদ্দিনের পিছু নিল।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বের হতেই মরুভূমি থেকে ধেয়ে আসা তপ্ত বাতাস ব্রেকহীন ট্রাকের মত ধাক্কা মেরে গেল ওকে। বছরের এই সময়ে দিনের বেলা তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে সাধারণত। আর রাতেরবেলা মরুভূমির সেই চিরায়ত অদ্ভুত বৈশিষ্ট অনুযায়ী সেটা ঝপ করে বারো ডিগ্রিতে নেমে আসে।

সবকিছু ঠিক থাকলে বাংলাদেশে ফেরত যাবার সময় এই এয়ারপোর্টে আর আসতে হবে না ওকে। ট্রেজার খুঁজে পেলে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রপথে যাত্রা করতে হবে। সেজন্য বিদায় নেবার আগে এয়ারপোর্ট ভবনটার দিকে এক নজর তাকাল। কিন্তু সাইফ জানে না, ওকে খুব শিঘ্রই আবার এখানে আসতে হবে।

কালো রঙের একটা বুইকের কাছে ওকে নিয়ে এলেন ওকে সালাহউদ্দিন।

কোনো ড্রাইভার নেই। সম্ভবত সালাহউদ্দিন নিজেই ড্রাইভ করবেন। সাইফ সামনে, ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে বসল। ড্রাইভিং সীটে শেইখ সালাহউদ্দিন।

কায়রো শহরের মাঝ দিয়ে চলছে গাড়ি। মূল শহর থেকে কায়রো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তিন কিলোমিটার দূরে। সেখান থেকে র্যামসিস আরো কিছুটা পথ। সাইফ যতদূর জানে নাসের বিন ইউসুফের বাড়ি র্যামসিসে। যদিও ও জানে না, এখন সেখানেই যাচ্ছে কিনা। পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর আর কথা হয়নি দুজনের মধ্যে। শুরু করল সাইফই।

'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'নাসেরের বাড়িতে।' সামনের দিকে তাকিয়েই জবাব দিলেন শেইখ সালাহউদ্দিন।

'এখন কে থাকে সেখানে?'

'আমিই থাকি। অনেকদিন ধরেই নাসেরের ম্যানেজার ছিলাম আমি। কাছেপিঠে ওর আত্মীয় বলতে গেলে একমাত্র আমিই। যদিও দুসম্পর্কের ভাই হত, তবুও খুব আপন ছিলাম আমরা। বন্ধুও বলা চলে। অবশ্য আমার চাইতে কয়েক বছরের বড় ছিল নাসের। এছাড়া আত্মীয়দের মধ্যে কেউ প্রবাসী আবার কারো কোনো খোঁজ খবর নেই। মৃত্যুর আগে নাসের বুঝতে পেরেছিল, ওর মৃত্যুর পর এই দুধের মাছিরাই এসে হামলে পড়বে। এজন্য আমার পরামর্শেই সমস্ত সম্পত্তি একটা ট্রাস্টিতে দিয়ে যায়। আর আমার নামে ওর পারিবারিক ঐতিহ্য বাড়িটা আর একটা ব্যবসা লিখে দিয়ে যায়। আমিও বলতে গেলে একা মানুষই। স্ত্রী নেই, শুধু একটা মেয়ে।'

কিছু না জিজ্ঞেস করলে খারাপ দেখায় এজন্য সাইফ বলল, 'আপনার মেয়ে কী করে?'

‘এতদিন লন্ডনে পড়াশোনা করত জার্নালিজম নিয়ে। কয়েকমাস আগে পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরে এসেছে। আপাতত ভাল একটা জব খুঁজছে।’

সাইফ বুঝতে পারছে, শেইখ সালাহউদ্দিন স্বাভাবিকভাবেই চাচ্ছেন, সাইফ তার বাড়িতেই উঠুক। কিন্তু সেটা করা মোটেও ঠিক হবে না। এখানে ও এসেছে খুবই গোপন একটা মিশন নিয়ে। যদি কোনোভাবে ব্যাপারটা কেঁচে যায় তবে বাপ মেয়েকে ভাল বিপদেই পড়তে হবে। ব্যাপারটা শেইখ সালাহউদ্দিনকে খুলে বলাই ভাল।

‘এক্সকিউজ মি, আমি কিন্তু হোটেলে থাকব।’

‘হোটেলে থাকবেন মানে?’ বিস্ময় ঝড়ে পড়ল সালাহউদ্দিনের কন্ঠে। ‘আমার এত বড় বাড়ি থাকতে...।’

‘বুঝতে চেষ্টা করুন, আমার এখানে আসার উদ্দেশ্য যদি কোনোভাবে কর্তৃপক্ষের গোচরে আসে তবে আমার আশ্রয়দাতা হিসেবে সবচাইতে আগে আপনি আর আপনার মেয়ে বিপদে পড়বেন। আমি সেটা চাচ্ছি না। তবে আপনি কিছু মনে না করলে আজ রাতটা আপনার বাড়িতেই থাকব।’

মাথা ঝাঁকালেন সালাহউদ্দিন। ব্যাপারটা মেনে নিয়েছেন। ‘হুম, শিওর।’

কিচ্ছুক্ষন পরই বিশাল এক ফ্রেঞ্চ স্টাইলের ডুপ্লেক্স বাড়ির ড্রাইভওয়েতে এসে দাঁড়াল বুইক। চমৎকার দোতলা বাড়ি। যদিও দেখে মনে হচ্ছে কমপক্ষে সাড়ে তিনতলা হবে!

সাইফকে পথ দেখিয়ে সরাসরি ড্রয়িংরুমে নিয়ে এলেন সালাহউদ্দিন।

বিশাল ড্রয়িংরুম। অনায়াসে ফুটবল খেলা যাবে। পাশেই ডাইনিং স্পেস। চমৎকার ডেকোরেশন। নাসের বিন ইউসুফ বেশ শৌখিন মানুষ ছিলেন দেখা যায়।

‘ওই যে, ওয়াশরুম। আপনি ফ্রেশ হয়ে নিন, আমি আসছি।’ বলে চলে গেলেন

সালাহউদ্দিন।

সাইফ ওয়াশরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে এসে দেখল টেবিলে নাস্তা দেয়া হয়েছে। মনেই ছিল না, এখন সকাল। নাস্তা দেখে মনে পড়ল। বাংলাদেশের চাইতে কায়রোর সময় চারঘন্টা এগিয়ে। রিস্টওয়াচের টাইম ঠিক করে নিল সাইফ।

নাস্তার পরিমাণ দেখে বোঝা যাচ্ছে বাড়ির লোকজনও নাস্তা করেনি। সোফায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল সাইফ। একটা ম্যাগাজিন উল্টাচ্ছে। ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় চোখ রাখতে গিয়ে অনুভব করল মারাত্মক ঘুম পেয়েছে ওর। প্লেনে ঘুমাতে পারে না সাইফ। তাছাড়া টাইমল্যাগও কিছুটা ক্লান্ত করে ফেলেছে।

এমন সময় কারো আগমন টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। উপর থেকে শেইখ সালাহউদ্দিন নেমে আসছেন। ঠিক তার পেছনেই বছর চব্বিশের এক তরুণী। নিশ্চয়ই শেইখ সালাহউদ্দিনের মেয়ে। নামটা জানা হয়নি।

মেয়েটা আরো কাছে আসতেই কিছু সময়ের জন্য থমকে গেল সাইফ। একটা স্কার্ফ জড়ানো মেয়েটার মাথায়। সম্ভবত মেহমানের খাতিরেই। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। তাতেই মেয়েটার রুপ যেন বেড়ে গেছে অনেকখানি। চোখ সরিয়ে নিতে বেশ বেগই পেতে হল সাইফকে!

‘আমার মেয়ে, সুমাইয়া হোসাইনি।’

‘আসসালামু আলাইকুম।’ জলতরঙ্গের মত রিনরিনে গলা সুমাইয়ার।

‘ওলাইকুম আস সালাম। জবাব দিল সাইফ। ‘আমি সাইফ হাসান।’

‘মেজর?’

‘সরি? ওহ... হ্যাঁ।’ হেসে ফেলল সাইফ।

সুমাইয়াও মুচকি হাসল। ‘আসুন, শুরু করা যাক।’

‘শিওর।’

বাপ বেটির পেছন পেছন একটা চেয়ার দখল করল সাইফ। কিছুক্ষন নীরবে খাওয়া চলল। খেতে খেতেই কাজের কথা পাড়ল সাইফ।

‘আচ্ছা, কাজের কথায় আসা যাক। আমাদের হাতে সময় নেই। যত দ্রুত সম্ভব কাজে নেমে পড়তে হবে। আপনি কি আমাকে একটু ডিটেইলস বলতে পারবেন জায়গাটার ব্যাপারে।’

গলা খাঁকারি দিলেন সালাহউদ্দিন। ‘আগেই জেনেছেন হয়ত, জায়গাটার এগজ্যাক্ট পজিশন নাসের আমাকে বলে যেতে পারেনি। ম্যাপে অস্পষ্টভাবে একটা এরিয়া নির্ধারণ করে দিয়ে গেছে। এরিয়াটা বিশাল। মরুভূমির মধ্যে হওয়ায় ম্যাপে ডিটেইল কিছু নেই। আমি আপনাকে ওই এরিয়ায় নিয়ে যেতে পারব। খোঁজাখুঁজি করতে হবে প্রচুর, কিন্তু...।’ থেমে গেলেন সালাহউদ্দিন।

‘কিন্তু?’

‘আসলে মরুভূমির ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম। একা একা যাওয়া হয়নি কখনো। মাঝে মধ্যে নাসেরের সাথে যাওয়া হত। সেজন্য বলছিলাম, খোঁজাখুঁজির জন্য একজন গাইড যোগার করতে পারলে সবচাইতে ভাল হত।’

‘গাইড?’ অস্ফুটে বলল সাইফ। চিন্তা করে দেখছে গাইডের কাছ থেকে আসল ব্যাপারটা গোপন রেখে খোঁজাখুঁজি চালানোটা সম্ভব কিনা। মনে হচ্ছে সম্ভব। একটা প্ল্যান আছে মাথায়।

‘ওকে, সমস্যা নেই। আমি তো কাল হোটেলে যাচ্ছি, ওখান থেকেই কাউকে যোগার করে নেয়া যাবে। আপনার পরিচিত কেউ আছে কি?’

মাথা নাড়লেন সালাহউদ্দিন। ‘নাহ, তেমন কেউ তো নেই। হোটেল থেকে যোগার করলেই ভাল হবে। তবে আপনি অনুমতি দিলে আমিই ব্যাবস্থা করতাম।’

‘না, এই সামান্য কাজটুকু আমিই পারব।’

‘ওকে, থ্যাঙ্কস।’

এরপর নীরবে খাওয়া চলল। এর মধ্যে সুমাইয়া একটা কথাও বলেনি। চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, মেয়েটা ওর পরিচয়, এখানে আসার উদ্দেশ্য, সবই জানে। একটু পর খাওয়া শেষ হতে সুমাইয়া বিদায় নিয়ে উপরে চলে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হতেই সালাহউদ্দিন বললেন, ‘আপনি বিশ্রাম নিন। কাল থেকেই তো আবার কাজে নেমে পড়তে হবে।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সাইফ।

সালাহউদ্দিন হাঁক ছেড়ে একজন কাজের লোককে ডেকে সাইফের লাগেজটা ওর রুমে নিয়ে রাখতে বললেন। এরপর তিনি নিজেই সাইফকে নিয়ে চললেন ওর রুম দেখাতে।

সাইফ শেইখ সালাহউদ্দিনের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেল।

একটা মাঝারি আকারের রুমে নিয়ে এলেন ওকে সালাহউদ্দিন। অন্য সব রুমের মত এই রুমটাও চমৎকার সাজানো। বিশেষ করে পরিপাটি বিছানা দেখেই অবসাদ ঘিরে ধরল সাইফকে।

‘আপনি বিশ্রাম নিন, পরে কথা হবে।’ সালাহউদ্দিন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

দরজা লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সাইফ।

আর্মিতে থাকাকালীন একবার এক ঘূর্নিঝড় আক্রান্ত গ্রামে ত্রান নিয়ে যেতে হয়েছিল ওদের। ওখানে যাবার পর দ্বিতীয় দফা ঝড় শুরু হয়। সেবার টানা চারদিন এক সেকেন্ডের জন্যও বিছানায় পিঠ ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু এই মুহূর্তে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে চাইছে। নইলে প্রয়োজনের সময় বেঁকে বসতে পারে দেহঘড়ি। এই মুহূর্তে নিজেকে ফিট রাখতে হবে। কাল থেকেই শুরু হবে এক অসম্ভবকে সম্ভব করার মিশন।

মিশন ইম্পসিবল!

ভাবতেই মুচকি হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

ঠোঁটে হাসি নিয়েই ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল সাইফ হাসান।

একটানা বিকেল পর্যন্ত ঘুমাল সাইফ। দীর্ঘ ঘুমের কারনে মাথা কিছুটা ভার হয়ে আছে। বিছানা ছেঁড়ে সোজা বাথরুমে ঢুকল। দীর্ঘ সময় ধরে শাওয়ার নিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল টগবগে এক সাইফ হাসান। এই মুহূর্তে পুরো কায়রোতে দৌড় লাগাতে পারবে!

জামা কাপড় পাল্টে নীচে নেমে এল। সামান্য খিদে পেয়েছে, তবে এখন আর খাবে না। একটু বের হবার ইচ্ছা আছে। কায়রো শহরটা ঘুরে দেখবে। এখানে সম্ভবত ওকে অনেকদিন থাকতে হবে। পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়াটা জরুরী।

নীচে নামতেই দেখতে পেল শেইখ সালাহউদ্দিন ড্রয়িংরুমে বসে পত্রিকা পড়ছেন। ওর উপস্থিতি টের পেয়েই মুখে হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

‘ঘুম কেমন হল।’

‘ভালো।’ উজ্জ্বল একটা হাসি দিয়ে কথাটার সত্যতা প্রমান করল সাইফ।

‘খাবার দিতে বলি?’

‘নো, থ্যাংকস। আমি আসলে কায়রো শহরটা ঘুরে দেখতে চাইছিলাম একটু। কাল থেকেই তো কাজে লেগে যেতে হবে।’

‘শিওর। আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি।’ এরপর কেমন একটা ইতস্তত ভঙ্গি দেখা গেল তাঁর মধ্যে। কিছু একটা যেন বলতে চাইছেন। এক সময় ইতস্ততা ঝেড়ে ফেলে বললেন, ‘স্যুমাইয়া কি আপনার সাথে যেতে পারে?’ এরপর তড়িঘড়ি করে কৈফিয়তের সূরে বললেন, ‘বিদেশে পড়াশোনা করাতে এখানে

ওর তেমন বন্ধু বান্ধব নেই। বেচারি তিনমাস হল দেশে এসেছে এরমধ্যে একদিনও বাইরে ঘুরতে বের হয়নি। আমিও ব্যবসার কাজে ওকে সময় দিতে পারি না। এই তো এখনই আবার আমাকে বের হতে হবে একটা কাজে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর।'

'অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, খাবার খেতে না চাইলে কফি দিতে বলি?'

'হুম, বলতে পারেন।'

'ওকে, আমি স্যুমাইয়াকে বলছি। ড্রাইভারকে বলে দেব, আপনাদের ঘুরিয়ে আনবে।' বলে উপরে চলে গেলেন সালাহউদ্দিন।

একটু পর একজন এসে একপট কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিতেই মনটা আরো খানিকটা সতেজ হয়ে গেল। কফি শেষ হবার আগেই উপর থেকে নেমে এল স্যুমাইয়া। গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা বোরকা জাতীয় কি একটা পোশাক পরনে। কালোর উপরে হায়ারোগ্লিফিকের মত নকশা করা। সম্ভবত মিশরের ঐতিহ্যবাহী পোশাক। মাথায় সকালের মতই স্কার্ফ। চোখ সরিয়ে নিতে আবারও বেগ পেতে হল সাইফকে!

'আপনাকে ঝামেলায় ফেলে দিলাম।' কাছে এসে মুচকি হেসে বলল স্যুমাইয়া।

'এরকম ঝামেলায় মাঝে মধ্যে পড়তে মন্দ লাগে না!'

চেষ্টা করেও নিঃশব্দে হাসতে পারল না স্যুমাইয়া।

'যাওয়া যাক তবে।' বলল সাইফ।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুইকটার কাছে চলে এল ওরা। একজন ড্রাইভার বসা।

'গাড়িটা চাচার খুব প্রিয় ছিল। অনেক আগে কিনেছিলেন। বেশিরভাগ সময় এটাতেই চড়তেন।' গাড়িতে ওঠার সময় বলল স্যুমাইয়া। মেয়েটা বেশ প্রানবন্ত। সাইফ মনে মনে খুশি হয়ে উঠল। অন্তত কোনো কাঠের পুতুলের

সাথে ঘুরুতে বের হতে হচ্ছে না।

‘কোথায় যাবার ইচ্ছা ছিল আপনার?’ গাড়ি চলতে শুরু করলে আবারও জিজ্ঞেস করল স্মমাইয়া।

‘বিশেষ কোথাও না। উদ্দেশ্যহীন। তবে এখন যেহেতু আপনি আছেন সেহেতু আপনার উপরে ছেড়ে দিলাম দায়িত্বটা। আপনার দেশ আপনিই ঠিক করুন।’

‘আমার দেশ হলেও আমি খুব বেশি কিছু চিনি না। তেমন একটা বের হওয়া হয় না। আপনি না থাকলে আজও হত না।’

‘হুম, আপনার বাবা বললেন।’

‘উমম... মিউজিয়ামে যাবেন?’

‘যাওয়া যায়। কাছেই তো। আসার পথে দেখেছিলাম বোধহয়।’

‘উহু, ওটা না। ওটা র্যামসিস রেলওয়ে মিউজিয়াম। আমি কায়রো মিউজিয়ামের কথা বলছিলাম। ওটা ভালই দূর আছে। তাহরীর স্কয়ারে।’

‘ওখানেই নিশ্চয়ই ফারাওদের মমি টমি আছে?’

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল স্মমাইয়া। ‘আপনি আরো দুবছর পর এলে আপনাকে ‘গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম’ দেখাতে পারতাম। গিজাতে তৈরি হচ্ছে। বিশ্বের সবচাইতে বড় আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম হবে এটা। এগারো লক্ষ স্কয়ার ফিটের। আর্কিটেকচারাল ডিজাইন মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত। ৭৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হচ্ছে।’ বলার সময় মুখটা গর্বে উজ্জ্বল দেখাল স্মমাইয়ার। যেমনটা প্রতিটা বাঙ্গালীর উজ্জ্বল দেখায় বাংলাদেশের কোনো কীর্তি বলার সময়। আসলে দেশরপ্রেমের জায়গাটাতে সবাই খুব স্বার্থপর।

‘এবার জান নিয়ে ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারলে নিশ্চয়ই আসবো মিউজিয়ামটা দেখার জন্য!’ হালকা চালে বলল সাইফ।

সাইফের বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলল মেয়েটা। এরপর বলল, 'জানের প্রশ্ন আসছে কেন? আপনি কি বিপদের আশংকা করছেন?'

'না করার কি কোনো কারণ আছে?'

'ব্যাপারটা তো আমি আর বাবা ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'তা না জানুক। কিন্তু আমি যে জিনিসটার জন্য এসেছি সেটার গায়ে মানুষের রক্ত লেগেই যায়।' ড্রাইভারের কারণে সাবধানে রেখে ঢেকে কথা বলছে সাইফ। হয়ত মাঝবয়সী ড্রাইভারটা খুবই বিশ্বস্ত, এরপরও কোনো ঝুকিই নিতে চাচ্ছে না সাইফ। 'মানুষের আদিম প্রবৃত্তিই কিভাবে কিভাবে যেন টেনে আনে। অন্তত ইতিহাস তো তেমনই বলে।'

'তারমানে আপনি স্রেফ ভয় থেকে কথাগুলো বলছেন?'

'তা একরকম বলতে পারেন।'

'তাহলে বলব, ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যাই হবে না।'

'না হলেই তো ভাল।'

কিছুক্ষনের জন্য বিরতি নেমে এল। এবার সাইফই ভেঙ্গে ফেলল সেটা। 'আচ্ছা, আপনি পড়াশোনা করেছেন কোথায়?'

'অক্সফোর্ড'

'গ্রেট।'

'আপনি?'

'আমিও।'

'অক্সফোর্ডে?'

'লন্ডনের না, প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে।'

‘মানে?’

‘মানে, আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘প্রাচ্যের অক্সফোর্ড’ বলা হয়।’ এবার সেই উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল সাইফের চোখে মুখে। ইচ্ছে করেই বলল না, হার্ভার্ড-এ ক্রিমিনালজি’ র উপর পড়াশোনা করেছে ও।’

‘আচ্ছা! দারুণ তো!’

সাইফ কিছু বলল না।

কিচ্ছুক্ষন পরই গাড়ি থেমে গেল।

‘চলে এসেছি,’ বলে নেমে পড়ল স্কুমাইয়া।

সাইফও নেমে পড়ল। মিউজিয়ামটা বিশালাকৃতির লাল রঙের ভবনে অবস্থিত। বেশ পুরনো ধাঁচের।

‘অনেক আগের তৈরি মনে হচ্ছে।’ সাইফ দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল।

‘হুম।’ মাথা ঝাঁকাল স্কুমাইয়া। এই মিউজিউয়ামটা অনেক জায়গায় স্থানানন্তিত করা হয় বিভিন্ন কারণে। অবশেষে ১৯০২ সাল থেকে এখানেই আছে।’

টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা।

ভেতরে ঢুকতেই স্কুমাইয়া প্রশ্ন করল, ‘আগে কোথায় যাবেন? এই মিউজিয়ামে দুটো মেইন ফ্লোর রয়েছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছে প্যাপিরাস আর কয়েনের কালেকশন। আর ফার্স্ট ফ্লোরে আছে মমি, সারকোফেগাস এসব।’

‘আগে কয়েন দেখে আসি তাহলে।’ মুচকি হেসে বলল সাইফ।

‘চলুন।’

গ্রাউন্ড ফ্লোরে চলে এল ওরা। এখানে ইজিপশিয়ান ছাড়াও গ্রিক, ল্যাটিন আর ইসলামি ঐতিহ্যের বেশ কিছু আর্টিফ্যাক্টস আছে। বেশিরভাগই প্যাপিরাস আর

আর কয়েন। এখানে দেখা শেষে চলে এল ফার্স্ট ফ্লোরে। এখানে শুধু মমি আর মমি। তুতানখামেন,
থুতমোসিসসহ আরো উদ্ভট নাম বিশিষ্ট ফারাওদের প্রচুর মমি দেখতে পেল সাইফ। এদের মধ্যে ফারাও তুতানখামেন এর মমিটা এপর্যন্ত প্রাপ্ত সবচাইতে প্রাচীন মমি। এরপর চলে এল র্যামসিস দ্বিতীয়-এর মমির কাছে। ধারণা করা হয় এই সেই "ফেরাউন", যার কথা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। র্যামসিস দ্বিতীয় ছিল খৃষ্টপূর্ব ১০৬৯ থেকে ১৫৫০ পর্যন্ত ব্যাপ্ত "নিউ কিংডম" ডায়নাস্টির একজন ফারাও। এখানে আসার পেছনে এই মমিটা দেখার আগ্রহই সবচাইতে বেশি ছিল সাইফের। এরপর তুতানাখামেনের মমি। এই দুটো দেখা হতেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলল সাইফ।

স্কমাইয়াকে বলল, 'শুকনো লাশগুলো দেখে ভয় পাচ্ছি, বের হতে পারি এখান থেকে?'

সশব্দে হেসে উঠল স্কমাইয়া। 'সত্যিই এত ভীতু আপনি?'

'হুম, সেজন্যই তো আর্মিতে টিকতে পারিনি।'

বিস্ময় ভর করল স্কমাইয়ার চোখে। 'টিকতে পারেননি মানে? তারমানে, আপনি এখন আর্মিতে নেই?'

'নাহ।'

'তাই নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম আপনাদের দেশের সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে গোপন মিশন দিয়ে পাঠানো হয়েছে।'

মুচকি হেসে মাথা নাড়ল সাইফ। 'বলতে পারেন আমি চুরি করতে এসেছি এখানে। তবে নিশ্চিত থাকতে পারেন, ট্রেজার পেলে সেটা আমাদের দেশের জন্যই ব্যয় করা হবে।'

'কি করবেন আপনি এত টাকা দিয়ে?'

‘আমি না, আমরা। চলুন কোথাও বসে কথা বলা যাক।’

‘ওহ, শিওর।’

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

* * *

আলো আঁধারি ঘেরা একটা রেস্টুরেন্টে বসে আছে সাইফ আর সুমাইয়া।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে বেশ মজা পাচ্ছে সাইফ। এখানেও কমবয়সী কপোত-কপোতীরা ঘন হয়ে বসে প্রেমালাপ করছে। ঠিক যেমনটা দেশের প্রায় সব রেস্টুরেন্টেই দেখা যায়। প্রেমের ভাষা বোধহয় সব জায়গাতে একই!

সুমাইয়া মিশরের ঐতিহ্যবাহী খাবার দাবার অর্ডার করেছে। এরমধ্যে মেইন ডিশ হল, “কোশারী”। ডেজার্ট হিসেবে আছে, “হালাওয়া”। সাইফের ধারণা এই “হালাওয়া”ই বাংলাদেশে গিয়ে “হালুয়া” হয়েছে।

এই জিনিসটা সাইফের সবসময়ই হয়, দেশের বাইরে এলে সব জিনিসের মধ্যেই দেশের ছায়া খুঁজে পায়।

‘তো, তারপর, বলুন, ট্রেজার পেলে কি করবেন আপনারা?’ খাবার আসার অবসরে জিজ্ঞেস করল সুমাইয়া।

সাইফ কপোত-কপোতীদের থেকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ‘উমম, আসলে গোড়া থেকে বলতে গেলে, এই স্বপ্নটা মূলত আমি দেখিনি। তবে এই মুহূর্তে স্বপ্নটা আমারও। আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যাক্তি, কর্নেল আজহার চৌধুরী এমন একটা সিক্রেট সার্ভিসের স্বপ্ন দেখতেন যেটা অনায়াসে সিআইএ, এমআইসিক্স কিংবা আপনাদের প্রতিবেশী ইজরাইলের মোসাদকে টেক্কা দিতে পারবে। কিন্তু একটা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আমরা

চাইলেই সব কিছু করতে পারব না। আমাদের করতে দেয়া হবে না। সেজন্য তাঁর ইচ্ছে একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি চালু করা। সারা পৃথিবীতে এর শাখা থাকবে। মূলত এর কাজ হবে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন, কিন্তু গোপনে বাংলাদেশ সরকারের হয়ে এসপিওনাজের কাজও করবে।'

'কিন্তু আপনাদের সরকার কি এটা মেনে নেবে?'

'ভাল কাজ দেখাতে পারলে তো না মেনে নেয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া একটা দেশের জন্য এসপিওনাজের ভূমিকা এই যুগে কেউই অস্বীকার করতে পারবে না।'

'তাহলে তো প্রচুর টাকার প্রয়োজন।'

'হ্যাঁ, সেজন্যই এই ট্রেজার আমাদের খুব প্রয়োজন। এটা না পেলে আমাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।'

'কিন্তু আপনাদের দেশের জন্য তো কনসেপ্টটা একেবারেই নতুন, জনবল পাবেন কিভাবে?'

'তরুনদেরই গড়ে পিটে নিতে হবে। অনেক রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার ট্রেইনিং দিতে পারবে শিক্ষানবীসদের। তাছাড়া একবার সরকারের স্নজরে আসতে পারলে আর্মি থেকে প্রত্যক্ষভাবেই সাহায্য পাওয়া যাবে।'

'সবকিছুই ভেবে রেখেছেন মনে হচ্ছে?'

'নাহ, সব আর ভাবলাম কই? এই মুহূর্তে একটাই ভাবনা-ট্রেজার। নইলে এসব ভাবনার এক পয়সা দাম নেই।'

'হুম, তারমানে আমি এখন একজন ভাবী স্পাইয়ের সামনে বসে আছি?' হালকা চালে বলল স্নমাইয়া।

'বলতে পারেন, তবে আমি আর্মির ইন্টলিজেন্স উইং এর হয়ে কিছুদিন কাজ

করেছি। সুতরাং চাইলে এখনও স্পাই বলতে পারেন।' সাইফও রসিকতা করল। কিন্তু এতেই সুমাইয়ার চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

'সত্যিই আপনি একজন স্পাই? !'

আবারও মুচকি হাসল সাইফ। জেমস বন্ড ব্যাটা মানুষের মনে স্পাইদের ব্যাপারে ভালই ফ্যাসিনেশন তৈরি করতে পেরেছে! মানুষ ভাবে, স্পাইদের কোনো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বগলের তলায় সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল নিয়ে সারাবিশ্ব ঘুরে বেড়াও, আর সুন্দরী মেয়েদের বগলদাবা করো!

বাস্তবে স্পাইরা অনেক সুযোগ সুবিধা পেলেও তাদের প্রতি মুহূর্ত যেভাবে জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে কাটাতে হয় তাঁর তুলনায় এই আয়েশী জীবন কোনো মূল্যই রাখে না। তবুও সাইফের আজন্ম স্বপ্ন, এভাবে দেশের জন্য জীবনটাকে হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে দেশ দেশান্তরে।

ভাবতে ভাবতেই ডিনার নিয়ে হাজির হল ওয়েটার। সার্ভ করল।

'নিন, শুরু করুন।' ওয়েটার বিদায় নিতেই বলল সুমাইয়া।

সাইফ আগে মেইন ডিশটাই প্লেটে তুলে নিল। স্বাদটা চমৎকার, তবে এটার সাথেও দেশী একটা খাবারের যথেষ্ট মিল দেখতে পেল।

'আগে "কোশারী"ই নিলেন দেখছি। কেমন?'

'হুম, ডিলিশিয়াস। তবে আমাদের দেশের একটা খাবারের সাথে মিল আছে।'

'তাই নাকি? কী খাবার?'

'খিচুড়ি!'

'কিশোরী?' অদ্ভুত উচ্চারণে বলল সুমাইয়া।

সাইফ হো হো করে হেসে উঠল। "কিশোরী" না, ওটা আবার অন্য জিনিস। খিচুড়ি।'

স্মাইয়া আর দ্বিতীয়বার উচ্চারনের ঝুঁকি নিতে গেল না। হাসি মুখে কেবল একবার 'ও আচ্ছা' বলল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সাইফ খেয়াল করল, "কোশারী" আর "খিচুড়ি"র নামের মধ্যেও বেশ মিল আছে। তবে কি "হালাওয়া"র মত এই "কোশারী"ই "খিচুড়ির" পূর্বপুরুষ? !

***

পরদিন।

বেলা এগারোটা, হোটেল নীল হিলটন, কায়রো।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে হিলটনে চলে এসেছে সাইফ। কিছুক্ষন আগেই চেক-ইন করেছে। রুমে ঢুকেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। ওর রুম দোতলায়। হোটেলটা নীলনদের একেবারে তীর ঘেঁষে। প্রায় দেয়ালজোড়া বিশাল কাচের উইন্ডোটা দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই নীল রঙের দুর্দান্ত নীলনদ দেখা যায়। হঠাৎ দেখায় সমুদ্র বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র না। দূরে এক জায়গায় নদীর মধ্যে সবুজ একটা টুকরো ভাসছে। ওটা একটা দ্বীপ। ওখানে রিসোর্ট তৈরি করা হয়েছে। সময় পেলে একবার ঢু মেরে আসবে ঠিক করল।

এমনসময় ওর প্রকৃতি দেখার বারোটা বাজিয়ে যান্ত্রিক স্বরে ইন্টারকমটা বেজে উঠল।

সাইফ এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল।

'গুড, মর্নিং স্যার। একজন গাইড পাওয়া গিয়েছে, পাঠিয়ে দেব?' ওপাশ থেকে বলা হল।

'ওকে, পাঠিয়ে দিন। থ্যাংকস।'

‘ওয়েলকাম, স্যার।’

লাইনটা কেটে দিল সাইফ। হোটেলে চেক-ইন করবার সময় রিসিপশনে বলে এসেছিল ভাল কোনো গাইডকে ওর রুমে পাঠিয়ে দিতে। এইমাত্র সেটাই জানাল ওরা। দেরী করার উপায় নেই। আজ থেকেই কাজে নামতে চেয়েছিল, কিন্তু গাইডের অভাবে হল না।

খট খট করে দরজায় মৃদু নক হল।

সাইফ উঠে গিয়ে কী-হোলে চোখ রাখল। দেখে মনে হচ্ছে গাইডই এসেছে। দরজা খুলে দিল।

‘শুভ সকাল, স্যার।’ দরজা খুলতেই চকচকে একটা হাসি মুখে নিয়ে বলল আগন্তুক।

‘শুভ সকাল।’ সাইফও প্রতিউত্তর করল। দরজা পুরোপুরি মেলে ধরল আগন্তুককে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে। ‘বসুন আপনি।’

‘থ্যাংক ইউ, স্যার।’ বলে রুমে ঢুকে আগন্তুক এগিয়ে গেল কয়েক পা।

দরজা লাগাতে লাগাতে একনজরে তাকে মেপে নিল সাইফ। বয়সে ওর কিছুটা বড়ই হবে মনে হচ্ছে। উচ্চতায় অবশ্য ইঞ্চি তিনেক খাটো। মরুভূমির রোদে পুড়ে যাওয়া চেহারায় কিছুটা কঠোরতার ছাপ আছে। যেমনটা খেটে খাওয়া সব মানুষের চেহারাতেই থাকে। তবে ঠোঁটে একটা হাসি হাসি ভাব লেপ্টে রয়েছে।

সাইফ, এগিয়ে গিয়ে সোফায় লোকটার মুখোমুখি বসল।

‘নাম কী আপনার?’

‘মোবারক সিদ্দিকী।’ অমায়িক ভঙ্গিতে বলল আগন্তুক।

‘আচ্ছা, তুমি করেই বলি,’ এরপর মোবারকের সম্মতির অপেক্ষায় না থেকেই

বলল, ‘আমি সাইফ হাসান। কয়েকটা দিনের জন্য আমি মরুভূমিতে কিছুটা ঘোরাঘুরি করতে চাই।’

লোকটাকে সাইফের বেশ পছন্দই হয়েছে। আর ঝামেলা না করে একেই নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

‘নির্দিষ্ট কিছু কি খুঁজছেন?’

স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন। যেকোনো গাইডই করবে। সাইফ আংশিক সত্যি বলার সিদ্ধান্ত নিল।

‘হ্যাঁ, একটা নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে বের করতে চাই। তবে তোমাকে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে নির্দিষ্ট একটা এরিয়া ঠিক করে দেব, তুমি শুধু ওই এরিয়াটায় আমাদের নিয়ে যাবে। পুরো এরিয়াটা ঘুরিয়ে দেখাবে। মরুভূমিতে আমার কোনো একটা অভিজ্ঞতা নেই এজন্যই একজন গাইডের প্রয়োজন। আশা করি, কাজটা তুমি করতে পারবে?’

‘জী, স্যার, আমার জন্মই মরুভূমির এক বেদুইন পরিবারে। মরুভূমি আমার নিজের বিছানার মতই আপন!’

‘হুম, খুশি হলাম।’ নিরাসক্ত গলায় বলল সাইফ।

‘স্যার, ওই এরিয়াটার ব্যাপারে কিছু জানতে পারি?’

‘উঁহু, আজ না। আমরা আগামীকাল বের হব। তুমি কাল সকাল সাতটার দিকে এখানে চলে এসো। আমি মরুভূমিতে চলার উপযোগী ফোরহুইল ড্রাইভ গাড়ি যোগার করে রাখব।’

‘স্যার, গাড়ির দরকার হবে না, আমার নিজেরই একটা ল্যান্ড রোভার আছে।’

‘যাক, তাহলে তো ঝামেলা মিটেই গেল। তাহলে, ওই কথাই রইল, কাল সকাল সাতটায় তোমার গাড়ি নিয়ে এখানে চলে এসো। বাকি কথা তখন হবে।’

‘ওকে, স্যার, আমি তাহলে আজ আসি?’ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল মোবারক।

‘ওকে।’ সাইফও উঠে দাঁড়াল।

মোবারক বিদায় নিতেই সাইফ আবার বিশাল উইন্ডোর সামনে চলে এল। চিন্তায় ডুবে আছে।

Ebook Created by: Bangla Epub & Mobi Creator Team (fb group)

তিন

প্রায় দশ হাজার বছর আগের কথা। স্থান, উত্তর আফ্রিকা। বিশাল এলাকা জুড়ে নয়নাভিরাম হ্রদ। ছোট ছোট নদী বয়ে চলেছে কুলকুল করে। চরে বেড়াচ্ছে লম্বা গলার জিরাফ এবং আরো অনেক প্রাণী।

পাঁচ হাজার বছর আগে একদিন হঠাৎ করেই শুরু হল পরিবর্তন। আফ্রিকা থেকে বাতাস বয়ে নিয়ে আসতে শুরু করল বিপুল পরিমাণে ধুলো। বাতাসের আদ্রতা কমতে শুরু করল। আরো ধুলো এল, জমা হল। বিশাল সব হ্রদ ভরে উঠল বালিতে। হাজার বছরের পরিক্রমায় এক সময় জন্ম নিল এক ধূসর আতঙ্ক। সাহারা!

সাহারা, পৃথিবীর সবচাইতে বড় মরুভূমি। মিশর, মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, চাদ, সুদান, নাইজার পর্যন্ত যার বিস্তৃতি। আয়তন নব্বই লক্ষ বর্গকিলোমিটার।

আকাশের তপ্ত সূর্যটা ইচ্ছেমত গনগনে আগুন ঢেলে যাচ্ছে সাহারাতে। রোদের প্রখরতায় দূর দিগন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। ঢেউ খেলানো বালিয়ারির ভাঁজে ভাঁজে কখনো সখনো ঝিক করে উঠছে কী যেন। মনে হয় যেন পানি, আসলে মরীচিকা। বেশিক্ষন তাকিয়ে থাকা যায় না খালি চোখে। টপটপ করে পানি পড়তে শুরু করে। খালি মাথায় অনভ্যস্ত কেউ আধঘন্টার বেশি এই জ্বলন্ত তন্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে নিশ্চিতভাবেই ডিহাইড্রেশনের শিকার হবে। প্রথমে কিছুক্ষন গরমে পুড়ে যাবার অনুভূতি, এরপরই শুরু হবে কাঁপুনি। আশ্চর্য হলেও সত্যি, কাঁপুনিটা হবে তীব্র শীতে! সারা শরীর হি হি করে কাপতে থাকবে ওই দূর দিগন্তের মত। প্রখর রোদকে মনে হবে হিম

তুষার। একটা কম্বলের জন্য হাহাকার করে উঠবে মন! এরপর তীব্র মাথাব্যাথা, সেই সাথে বমি। ঠোট ফাঁটতে শুরু করবে। এবং এক সময় তাঁকে ঘিরে ফেলবে হিমশীতল মৃত্যু!

বিশাল এই সাহারার বুকে তিনজন আরোহী নিয়ে ছুটে চলেছে একটা সাদা রঙের ল্যান্ড রোভার। যদিও এই মুহূর্তে ওটাকে সাদা বলার উপায় নেই। তপ্ত মরুর ধুসর বালিতে ঢাকা পড়ে ওটাও ধুসর রঙ ধারণ করেছে। ঠিক ধুসর বললে রঙটাকে ঠিকমত বোঝা যাবে না। হাজার বছর রোদে পুড়ে কেমন তামাটে বর্ণে পরিণত হয়েছে বালিকণাগুলো।

ল্যান্ড রোভারের তিন যাত্রী হল, সাইফ হাসান, শেইখ সালাহউদ্দিন আর ড্রাইভিং সীটে মোবারক সিদ্দিকি। মোবারক সাইফের কথামত কাটায় কাটায় ঠিক সাড়ে সাতটায় নীল হিলটনে উপস্থিত হয়। তৈরিই ছিল সাইফ। দেরী না করে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে ওরা। শেইখ সালাহউদ্দিনকেও বলা ছিল। তাকে তার বাড়ি থেকে পিকআপ করেই রওনা দেয় মরুভূমির উদ্দেশ্যে। কায়রো ছাড়ার পর পরই শেইখ সালাহউদ্দিন ম্যাপ বের করে নাসের বিন ইউসুফের নির্দেশিত এরিয়াটা চিনিয়ে দেয় মোবারককে। সেখানে পৌঁছতে প্রায় দুঘন্টা লেগে গেছে ওদের।

মোবারক এরিয়াটা দেখে ধারণা করেছে এটার ব্যাপ্তি হবে প্রায় ১১৫ বর্গমাইল। শুনে সাইফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরো এরিয়াটা তিনভাগ করে করে তিনদিনে খোঁজাখুঁজি চালানো হবে। একদিনে ৪০ বর্গমাইল করে। মরুভূমির জন্য এটা নেহায়েত কম না। তাছাড়া দুপুরের দিকে রোদটা একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠে। ওই সময় খোঁজাখুঁজি বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছে মোবারক। সাইফও মেনে নিয়েছে। শেইখ সালাহউদ্দিন হয়ত সহ্য করতে পারবেন না এতটা ধকল।

মরুভূমিতে ঢোকার পর মোবারক আবারও সেই প্রশ্নটা করেছিল, ‘আমাদের ঠিক কী খুঁজতে হবে।’

এবারও সাইফ সেই আগের জবাবটাই দিয়েছে। সাইফের কথামত মোবারকও আর মাথা ঘামায়নি এ নিয়ে।

সাইফ নিজেও জানে না, আসলে ঠিক কী খুঁজছে ওরা। এখানে, মরুভূমিতে মাঝে মধ্যেই নাসের বিন ইউসুফের বর্ণিত পাথরের স্তূপের মত দেখা যাচ্ছে। সব একই রকম লাগে দেখতে। এরমধ্যে কোনো পিরামিডের ধ্বংসস্তূপ আলাদা করে চিহ্নিত করা একটা দুঃসাধ্য কাজ মনে হচ্ছে সাইফের কাছে। আর চলন্ত অবস্থায় সেটা স্রেফ অসম্ভব। একেবারে কাছ থেকে না দেখলে বোঝা খুবই মুশকিল। নাসের বিন ইউসুফ ভাগ্যক্রমে সেই ভগ্ন পিরামিডের খুব কাছে চলে গিয়েছিলেন বলেই বুঝতে পেরেছিলেন সেটা একটা পিরামিড। সুগম জায়গায় ওটার অবস্থান হলে চার পাঁচ হাজার বছর ধরে পিরামিডটা সবার চোখের আড়ালে থেকে যেত না।

তবে, শেইখ সালাহউদ্দিনকে খুব বেশি চিন্তিত দেখাচ্ছে না এ নিয়ে। যেন তিনি জানেন কী খুঁজতে হবে। আসলেই কী তাই? নাকি অন্য কোনো ব্যাপার আছে এর মধ্যে? সাইফের কেন যেন মনে হচ্ছে শেইখ সালাহউদ্দিন ওকে সবটা বলেননি। কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছেন। বাজে একটা সন্দেহ যে একেবারে আসেনি তা নয়। বেশ কয়েকবারই এসেছে। কর্নেলকে মেইলটা করার পর নাসের বিন ইউসুফের কি জায়গাটার সঠিক পজিশন মনে পড়ে গিয়েছিল? হয়ত। এবং সেটা সালাহউদ্দিনকে বলেও গিয়েছেন। কিন্তু সযত্নে ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছেন সালাহউদ্দিন। সাইফের আই-ওয়াশের জন্য মরুভূমিতে নিয়ে এসেছেন। কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর যখন একসময় ট্রেজারের সন্ধান না পেয়ে সাইফ হতাশ হয়ে ফিরে যাবে ঠিক তখনই... নাহ তাই বা হয় কী করে? নাসের বিন ইউসুফ এত বড় একটা দায়িত্ব নিশ্চয়ই যোগ্য লোকের হাতেই দিয়ে গেছেন।

পরক্ষনেই সুমাইয়াকে বলা ওর নিজের সেই কথাটাই মনে পড়ে যাচ্ছে, "আমি যে জিনিসটার জন্য এসেছি সেটার গায়ে মানুষের রক্ত লেগেই যায়। মানুষের

আদিম প্রবৃত্তিই কিভাবে কিভাবে যেন টেনে আনে এদিকে। অন্তত ইতিহাস তো তেমনই বলে।”

এখানেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে না তো?

আপাতত অবশ্য সাইফের কিছু করারও নেই চুপচাপ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করা ছাড়া। দেখা যাক, তিনদিনের অনুসন্ধান শেষে কোনো কূলকিনারা হয় কিনা। এরপর অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। আপাতত যেটা করা যায় সেটাই করছে সাইফ। বাইরে তাকিয়ে প্রকৃতি দেখছে। অবশ্য যদি এটাকে প্রকৃতি বলা যায়।

বাঁজা মরুভূমি। উষর, শুষ্ক, রুক্ষ। সবুজ তরুলতার সাথে আজন্ম দুশমনী। নিজের গায়ে স্পর্শও লাগতে দিতে নারাজ। শত্রুতা বৃষ্টির সাথেও। বছরে গড়ে ২০ সে.মি. এর বেশি বৃষ্টি হয় না এখানে। মাঝে মধ্যে অবশ্য কিছু মরুদ্যান দেখা যাচ্ছে, সেগুলোও রুক্ষ। পেছনে রেখে আসা কিছু মরুদ্যান বেদুইনরা দখলে নিয়েছে। যতই সাহারার গভীরে ঢুকে পড়ছে মরুদ্যানের সংখ্যা ও আকার ততই কমছে।

ফেলে আসা পথে কিছু পিরামিড চোখে পড়েছিল। কায়রোর উপকন্ঠ গিজায় অবস্থিত সবচাইতে বড় খুফুর পিরামিডও চলন্ত অবস্থায় দেখেছে এক নজরের জন্য। আঁশ মেটেনি। মিটবার কথাও না। মিশরে এসে পিরামিডের গা স্পর্শ না করা রীতিমত অন্যায়। একটাবারের জন্য হলেও ভেতরে না ঢোকা গুরুতর অপরাধ। হাজার হাজার বছর আগে আকাশ ছোঁয়া এই পিরামিডগুলো এতটা নিখুঁতভাবে কি করে তৈরি করা হয়েছিল, ভাবতে গেলেই ধাঁধিয়ে ওঠে মন। আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীটা অকালে ধ্বংস না হলে হয়ত এতটা মাথা ঘামাতে হত না মানুষকে। উত্তরটা পেয়ে যেত।

‘আমাদের বোধহয় এবার থামা উচিৎ।’ পাশ থেকে মোবারকের কন্ঠস্বর শুনতে পেয়ে চটকা ভাঙ্গল সাইফের।

সাইফ মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাতেই গাড়িটা ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল। মাথায় চওড়া ব্রিমের হ্যাঁট চাপিয়ে সাইফ বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। রোদের উত্তাপ আরো প্রবল হয়েছে। সারা গা চিড়বিড় করছে।

বেলা দুটো পর্যন্ত ওখানে একটা অস্থায়ী তাবু খাটিয়ে বিশ্রাম নিল ওরা। খাবার দাবারও সেরে নিল এই ফাঁকে। রোদের তেজ কিছুটা কমতেই ফের যাত্রা শুরু। একেবারে সন্ধ্যা পর্যন্ত। প্রথম দিনের টার্গেট, চল্লিশ কিলোমিটার এলাকা কাভার হতেই ফিরে চলল কায়রোর উদ্দেশ্যে। কাল আবার আসবে।

প্রথমদিনের অনুসন্ধান শেষে ফলাফল শূন্য।

হোটেলে ফিরতে বেশ রাত হল সাইফের। সারাদিনের ক্লান্তিতে কোনোমতে খাবার সেরে বিছানায় লম্বা হতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

পরদিন আবার শুরু হল সেই একঘেয়ে, ক্লান্তিকর অনুসন্ধান। নির্জন সাহারা স্নায়ুর উপর প্রচন্ড চাপ ফেলে। মরুভূমিতে পথ হারানো অনেক মানুষই নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে মারা পড়ে। কারণটা বুঝতে পারছে সাইফ বেশ ভাল মতই।

দ্বিতীয়দিনটাও কেটে গেলে ঘটনাবিহীন। তারপরের দিনটাও। সেই সাথে অনুসন্ধান শেষ হল ১১৫ বর্গমাইলের সার্চ এরিয়ার। এই তিনদিনের আশাব্যাঞ্জক কিছুই ঘটেনি। তবুও এত সহজে হাল ছাড়তে নারাজ সাইফ। যে পিরামিড হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে সেটা ওরা ক'দিনেই পেয়ে যাবে, এমনটা ভাবার অবকাশ নেই। নাসের বিন ইউসুফের মত ভাগ্য সবার হয় না। ওদের পরিশ্রম করে খুঁজে নিতে হবে।

প্রথম দফা অনুসন্ধান শেষে ওরা সবাই খুবই ক্লান্ত। এজন্য শেইখ সালাহউদ্দিনের সাথে পরামর্শ করে একদিনের বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় দফা অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাইফ। শেষেরদিন শেইখ সালাহউদ্দিনের মুখেও দুঃশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পেয়েছে সাইফ। অভিনয় কিনা বুঝতে পারেনি। না

হলেই ভাল। মানুষটাকে ওর পছন্দ হয়েছে। তার সাথে ঝামেলায় জড়াতে ওর ভাল লাগবে না। অন্তত সুমাইয়ার খাতিরে হলেও!

দ্বিতীয় দফা অনুসন্ধানের প্রথম দিনটাও কেটে গেল আশাব্যাঞ্জক কোনো ঘটনা ছাড়াই। দিনশেষে সাইফের প্রত্যাশার পারদ কিছুটা হলেও নেমে গেছে। পরের দুটো দিনে হয়ত শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। এরপর নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তৃতীয় দফার অনুসন্ধান শুরু করবে নাকি দেশে ফিরে যাবে শূন্য হাতে।

* * *

দ্বিতীয় দফা অনুসন্ধানের দ্বিতীয়দিন একটা ঘটনা ঘটল।

ওইদিন হঠাৎ করেই মধ্যাহ্নের বিরতির কিছুটা সময় আগে শেইখ সালাহউদ্দিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সম্ভবত ডিহাইড্রেশন। তাকে দোষ দেয়া যায় না। বয়স হয়েছে তার। সাইফের মত সামরিক অফিসারকেই যেখানে হিমশিম খেতে হয় সেখানে তিনি এই কয়দিন সুস্থ ছিলেন সেটাই বেশি। সাইফ হতাশ হয়ে উপলব্ধি করতে পারল, শেইখ সালাহউদ্দিনের এই অবস্থায় তৃতীয় দফা অনুসন্ধানের চিন্তা অবান্তর। কালকের মধ্যে যদি কিছু না হয় তবে... বাকিটা আর ভাবতে চাইল না সাইফ।

ঘন্টাখানেক বিশ্রাম নিতেই বেশ সুস্থবোধ করলেন শেইখ সালাহউদ্দিন। ভাগ্যক্রমে ওরা আজ যাত্রা বিরতি নিয়েছে একটা মরুদ্যানের পাশেই। খাওয়া দাওয়ার পর শেইখ সালাহউদ্দিন বললেন, মরুদ্যান থেকে একটু হেঁটে আসতে পারলে নাকি তার ভাল লাগবে। সাইফ নিজ থেকেই তাকে ঘুরিয়ে আনার

প্রস্তাব করল।

মোবারককে তাবুতে রেখে ওরা বেরিয়ে এল। মরুদ্যানের পরিবেশ কিছুটা হলেও শীতল। বাইরের মত বাতাসটা গায়ে জ্বালা না ধরিয়ে আরামই দিচ্ছে। ছোট ছোট শুষ্ক গাছগুলো অবশ্য তেমন ছায়া বিলাবার মত পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি। নিষ্ঠুর সাহারা পৌছতে দেয়নি।

মোবারকের শ্রবণসীমা পেরিয়ে এসে হঠাৎ শেইখ সালাহউদ্দিন বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, আপনি তো জানেন যে, নাসের মৃত্যুর আগে আমাকে ওই পিরামিডের সম্ভাব্য পজিশন জানিয়ে যায়, তাই না?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল সাইফ। 'তো?'

'ভুল জানেন আপনি।'

হঠাৎ করে মাথাটা ঘুরে উঠল সাইফের। এতদিনের অমানুষিক পরিশ্রমের পর শেইখ সালাহউদ্দিন এখন এসব কী বলছেন?

'তারমানে?' উত্তেজনায় কথাটা বেশ জোরেই বলে ফেলল সাইফ।

সাইফের উত্তেজনা লক্ষ্য করে স্মিত হেসে সালাহউদ্দিন

বললেন, 'পুরোটা আগে শুনুন।' এরপর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে একদিকে ইশারা করে বললেন, 'ওই টিলাগুলোর দিকে একবার তাকান তো।'

সাইফ তাকাল। পাশাপাশি তিনটা টিলা দেখা যাচ্ছে। ঠিক পাশাপাশি নয়, একটা সমান্তরাল কোণ সৃষ্টি করেছে টিলাগুলো। অনেকটা খুফুর তিনটা পিরামিডের মত। তেমন বিশেষত্ব নেই। আর দশটা টিলার মতই দেখতে।

'হুম, দেখলাম। তো?'

'এই টিলাগুলো হল সাইন।'

'কিসের সাইন?'

‘ট্রেজারের!’ বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাসলেন সালাহউদ্দিন।

সাইফের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আকুল পাথারে পড়ে গেছে। আবারও ফিরে চাইল টিলাগুলোর দিকে। এমন কিছুই নেই যা ট্রেজারকে নির্দেশ করতে পারে। আশেপাশে কোনো পাথরের স্তুপও চোখে পড়ল না।

‘বুঝতে পারছি না কিছু।’

শেইখ সালাহউদ্দিন সাইফের উৎকণ্ঠা উপভোগ করছেন মনে হল।

‘মাঝের টিলাটার ছায়ার দিকে তাকান তো একবার।’ বললেন সালাহউদ্দিন।

তাকাল সাইফ। এবার অবশ্য একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করল। মাঝের টিলাটা চল্লিশ ফুটের মত হবে। টিলার ছায়াটা খানিক অদ্ভুত। পুরোটা না, শুধু চুড়ার অংশটা। টিলাটা ত্রিভুজ আকৃতির। স্বাভাবিক নিয়মে ছায়াও ত্রিভুজাকৃতিরই হবার কথা, কিন্তু
ছায়াটা ঠিক ত্রিভুজাকৃতির নয়, বরং একটা ত্রিভুজের মাথায় একটা ছোট গোলক বসিয়ে দিলে
যেমন হবে, ঠিক তেমনি।

‘ছায়াটা একটু অদ্ভুত, তবে তাতে কী প্রমাণ হয়?’

‘প্রমাণ হয় আমরা ট্রেজারের খুব কাছাকাছিই আছি।’ এবারও হেসেই জবাব দিলেন সালাহউদ্দিন। অবশ্য সাইফের কৌতুহল চরমে পৌঁছবার আগেই আবার বললেন, ‘এই টিলাটার উপরে একটা গোলাকৃতির পাথর আছে। কিন্তু পাথরটা এমনভাবে বসানো হয়েছে যাতে করে নীচ থেকে দেখা যাবে না। শুধু মধ্যাহ্নের ঠিক একঘন্টা পর সুর্যটা যখন টিলার ঠিক পেছনে চলে যায়, ঠিক তখন মিনিট দশেকের জন্য মাটিতে পাথরটার ছায়া পড়ে। এছাড়া বোঝার কোন উপায় নেই ওখানে একটা পাথর আছে।’

সাইফ হতভম্ব হয়ে গেল। ‘কিন্তু এসব আপনি জানলেন কোত্থেকে? আর ওটা

যে ট্রেজারকে নির্দেশ করছে সেটাই বা এতটা নিশ্চয়তা দিয়ে কিভাবে বলছেন?'

'জেনেছি নাসেরের কাছ থেকে। আর পাথরটা নাসেরই ওখানে ওভাবে রেখেছিল পিরামিডটা খুঁজে পাবার জন্য। এই টিলাকে পেছনে রেখে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মোটামুটি তিন কিলোমিটারের মত এগোলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত পিরামিডের ধ্বংসস্তুপটা পাওয়া যাবে।'

পুরো ব্যাপারটা এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে সাইফের কাছে। 'ব্যাপারটা বেশি কাকতালীয় হয়ে গেল না? আপনার অসুস্থতার জন্য আজ এখানে বিরতি নিলাম আর এখানেই...' বলতে বলতে থেমে গেল সাইফ। 'ওহ মাই গড! তারমানে আপনি অসুস্থ নন? আপনার অভিনয় ছিল ওটা?'

আবারও মুচকি হাসলেন সালাহউদ্দিন। বলতে লাগলেন, 'এই টিলা তিনটের অবস্থান একটু অন্যরকম। সচরাচর দেখা যায় না। অনেকটা খুফুর পিরামিডত্রয়ের মত। নাসের এজন্যই এই টিলা বেছে নিয়েছিল। তবুও নিশ্চিত হবার জন্য মাথায় ওভাবে পাথর রেখে দেয়। সারাদিনে মাত্র মিনিট দশেকের জন্য ছায়াটা দৃশ্যমান হওয়ায় লোকের সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা এই পথে এর আগেও গিয়েছি, কিন্তু তখন টিলা তিনটে চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল আমার। আজ চোখে পড়তেই সন্দেহ হল। মোবারকের যেন সন্দেহ না হয় সেজন্য সামান্য অভিনয়ের প্রয়োজন পড়েছিল। খুব কি কাঁচা হয়েছে অভিনয়টা?'

'কাঁচা? আমি তো এম্বুলেন্স ডাকতে চেয়েছিলাম!'

হো হো করে হেসে উঠল দুজনেই।

সাইফের হঠাৎ করেই মনটা খুবই ভাল হয়ে গেছে। যদিও আসল কাজ শুরু হবে এরপরই। ট্রেজারগুলো এখনো সেখানে আছে কিনা, সেটাও একটা প্রশ্ন বটে!

‘বাই দ্যা ওয়ে, নাসের বিন ইউসুফ যে এলাকার পজিশন ছাড়াও আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য আপনাকে বলে গেছেন সেটা আমাকে আগে বলেননি কেন?’

‘উমম, কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সাইফ। নাসের আমাকে বলে গিয়েছিল, কর্নেল যাকে পাঠাবেন, আমি নিজে যতক্ষন পর্যন্ত তাঁকে বিশ্বাস করতে না পারি ততক্ষন পর্যন্ত যেন কথাটা গোপনই রাখি। যদিও নাসের ভাল করেই জানত, কর্নেল যোগ্য লোককেই পাঠাবেন। কিন্তু বোঝেনই তো, মানুষ মাত্রই ভুল।’

‘তা ঠিক কী দেখে মনে হল, টাকাগুলো আমি মেরে দেব না?’

‘মিস্টার সাইফ, আমি মানুষ চিনতে পারি।’

‘হুম, কিন্তু বোঝেনই তো, মানুষ মাত্রই ভুল।’ একই সূরে সালাহউদ্দিনের কথাটা ফিরিয়ে দিল সাইফ।

শেইখ সালাহউদ্দিনের কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল কথাটার মানে বুঝতে। অবাক হয়ে কিছুক্ষন তাকিয়ে রইলেন সাইফের দিকে। তারপর আবারও একই সাথে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন দুজন।

হাসি থামতেই কাজের কথায় চলে এল সাইফ। ‘আপনার বুদ্ধিটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। আপনার জায়গায় আমি হলেও এমনটাই করতাম। মোবারককে যে আমি সন্দেহ করি না তা নয়, তবে সতর্কতায় কোনো ধরনের ঢিল দিতে চাই না। আজ আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত যথারীতি খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাব। এবং আজ রাতেরবেলা আমি আবার আসব এখানে। একা। আপনার কথামত সেই পিরামিডের কাছে গিয়ে নিজের চোখে ট্রেজার দেখে আসব। যেহেতু কালই আমাদের দ্বিতীয় দফা অনুসন্ধানের শেষ দিন, সুতরাং আজ ট্রেজার পাই কিংবা না পাই, কালও এভাবেই অনুসন্ধানের ভান করে যাব। মোবারককে কিছুতেই বুঝতে দেয়া যাবে না, আমরা যা খুঁজছিলাম সেটা পেয়ে গেছি। যদি আল্লাহর রমহতে ট্রেজারগুলো এখনো থেকে থাকে তাহলে আগামী পরশু থেকে ওগুলো

উদ্ধারের কাজ শুরু করব।’

মাথা ঝাঁকিয়ে সাইফের পুরো প্ল্যানে সায় দিল সালাহউদ্দিন।

‘এখন তাহলে ফিরে চলুন। বেশি দেরী হলে মোবারক আবার কিছু সন্দেহ করে বসতে পারে।’ বলল সাইফ।

‘হ্যাঁ, চলুন।’

কিছুক্ষন পরই সাহারার ধুলো উড়িয়ে ল্যান্ড রোভারটা ছুটে চলল তিন আরোহীকে নিয়ে।

চার

হোটেল নীল হিলটন। সন্ধ্যা।

হালকা অ্যাশ কালারের একটা পুলওভার গায়ে চাপিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এল সাইফ। ঘন্টাদুয়েক আগেই মোবারক ওকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেছে সারাদিনের অনুসন্ধানের শেষে। সামান্য বিশ্রাম আর খাওয়া দাওয়া সেরে এখন আবার বের হচ্ছে সাইফ। যাবে ওই পিরামিডের উদ্দেশ্যে। নিজের চোখে দেখে আসবে ট্রেজারের অস্তিত্ব।

দরজা লক করে লিফটের দিকে এগোচ্ছে, ঠিক সেই সময় চাপা একটা শব্দ কানে এল সাইফের। মুহূর্তের ব্যাবধানে শব্দটা চিনতে পারল সাইফ। শব্দটার ব্যাপারে ও অনেক অভিজ্ঞ। জীবনে বহুবার শুনেছে। গুলীর আওয়াজ!

বিলাসবহুল এই হোটেলের সবগুলো কামরাই সাউন্ডপ্রুফ। এজন্য আওয়াজটা চাপা শোনালেও উৎস চিনতে পারল সাইফ। ওর দুই রুম পরের রুমটা থেকেই আওয়াজটা এসেছে। ব্যাপারটা দেখা প্রয়োজন। হোটেল রুমে গুলীর আওয়াজ সাধারণ ঘটনা হতে পারে না।

২৩৭ নাম্বার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষন ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত কড়ায় নাড়া দিল। সতর্ক।

দরজাটা অনড় রইল।

দ্বিতীয়বারের মত কড়া নাড়ল সাইফ। এবার বেশ জোরেসোরেই।

ঝট করে দরজা খুলে গেল। বেশি না, মাত্র আধ হাতের মত ফাঁক হল। ওপাশ

থেকে মধ্য ত্রিশের এক গাট্টাগোট্টা লোক কুতকুতে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভ্রু দুটো সার্বক্ষনিক কুঁচকে থাকায় একটা স্থায়ী ভাঁজ পড়ে গেছে কপালে। প্রথম দেখাতেই লোকটাকে ঝামেলাবাজ বলে চিহ্নিত করল সাইফ।

‘কী চাই?’ বলে উঠল লোকটা?

‘হোটেল সিকিউরিটি। আমরা কমপ্লেই পেয়েছি। একবার ভেতরে আসতে চাই।’ গলায় দৃঢ়তা নিয়ে বলল সাইফ।

‘আপনি ভুল দরজায় নক করেছেন, মিস্টার।’ কথাটা বলেই দরজা লাগিয়ে দিতে উদ্যত হল লোকটা।

ঝট করে দরজা আর চৌকাঠের মাঝে একটা পা ঢুকিয়ে দিল সাইফ।

দরজা বন্ধ করতে বাধা পেয়ে প্রথমে কয়েক মুহূর্ত সাইফের দিকে কুতকুতে দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল মিস্টার ঝামেলা। এরপর দরজাটা এক ঝটকায় সম্পুর্ন খুলেই সাইফের দিকে একটা ঘুসি ছুড়ে দিল।

ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে ছিল সাইফের শরীর। ঘুসিটাকে আসতে দেখে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ধরে ফেলল হাতটা। জুডোর একটা প্যাচ কষে মোচড় দিয়ে ঠেলে ধরল উপরের দিকে।

বেকায়দায় পড়ে গেল মিস্টার ঝামেলা। সাইফের সামান্য চাপেই মট করে ভেঙ্গে যাবে হাত। তাকে ওই অবস্থায়ই ঠেলে রুমের ভেতরে চলে এল সাইফ। পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। মিস্টার ঝামেলা রাগে সাপের মত হিসহিস করছে। তাকে হিসহিস করতে দিয়ে পুরো রুমের উপর নজর চালাল সাইফ।

যেন টর্নেডো বয়ে গেছে গোটা রুমটার মধ্য দিয়ে। সবকিছু তছনছ। কিছু জিনিস মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে। বিছানার চাদর এলোমেলো। এলোমেলো চাদরের উপর একইরকম এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে একটা মানুষের

দেহ। বেঁচে আছে না মারা গেছে বোঝা যাচ্ছে না। কপালের একপাশ থেকে রক্তের একটা ধারা কানের পেছন পর্যন্ত নেমে গেছে।

পুরো দৃশ্যটা দেখতে ছয় সেকেন্ডের বেশি লাগেনি। মনোযোগ মুহূর্তের জন্য সরে গিয়েছিল নিথর দেহটার দিকে। সুযোগটা পুরোমাত্রায় নিল মিস্টার ঝামেলা। সাইফের হাঁটু লক্ষ্য করে একটা লাথি ছুঁড়ল। এই লাথিটা ভয়ংকর। জায়গামত লাগলে হাঁটুর জোড়া থেকে ভেঙ্গে যেতে পারত সাইফের। শেষমুহূর্তে হাঁটুটা সরিয়ে নিতে পারলেও হাত থেকে ছুটে গেল মিস্টার ঝামেলার হাত। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই একটা ঘুসি হাঁকাল সাইফের মুখ লক্ষ্য করে।

নিজেকে তখনো সামলে নিতে পারেনি সাইফ। সরে যেতে চাইল, সফল হল না পুরোপুরি। ঘুসিটা মাথার একপাশে লাগল। তাতেই ব্যাথায় চোখে অন্ধকার দেখল সাইফ। ওই অবস্থায়ই আরেকটা ঘুসি আসতে দেখল। এবার এড়াতে পারল না। শুধু মুখটা ঘুরিয়ে নেয়ায় নাকটা চ্যাপ্টা হল না। ডান গালে আঘাত করল ঘুসিটা। চোখের অন্ধকার আরো গাঢ় হল সাইফের। চোয়ালটা অবশ হয়ে গেছে মনে হল।

মরিয়া হয়ে সাইফ উপলব্ধি করল, আর কয়েক সেকেন্ড সময় পেলেই লোকটা ওর বারোটা বাজিয়ে দেবে।

তৃতীয় ঘুসিটাকে আসতে দেখল সাইফ। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর গোটা দেহে। বাউলি কেটে ঘুসিটাকে পাশ কাটিয়ে লোকটার পাশে চলে এল। এরপর লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কানের নীচের নার্ভ সেন্টারে তীক্ষ্ণ এক খোঁচা দিল।

সমাপ্তি ঘটল স্বল্পদৈর্ঘ্যের হাতাহাতির। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে ঢলে পড়ল মিস্টার ঝামেলা।

সেদিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে চোয়াল ডলতে ডলতে এগিয়ে গেল বিছানায় পড়ে

থাকা দেহটার দিকে। পরীক্ষা করে দেখল, মারা যায়নি লোকটা। পালস স্বাভাবিক। শুধু জ্ঞান হারিয়েছে। এঁর বয়স মিস্টার ঝামেলার চাইতে কিছুটা বেশি হবে।

বেসিন থেকে এক আঁজলা পানি এনে ছিটিয়ে দিল লোকটার চোখে মুখে। কিছুক্ষনের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসতে শুরু করল। চোখ পিটপিট করছে। আর কয়েক মুহূর্ত পর চোখ মেললেন। চোখে শূন্য দৃষ্টি ফুটে উঠল। এরপর চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওই শয়তানটা কোথায়?'

'ওকে নিয়ে আপনার ভাবতে হবে না। আপনি এখন সম্পুর্ন নিরাপদ।'

'আপনি কে?'

'আমি সাইফ হাসান। আপনাদের রুমের সামনে দিয়ে যাবার সময় গুলীর আওয়াজ পেয়ে দেখতে এসেছিলাম। কী হয়েছিল, একটু বলবেন?'

'ওহ...' সোজা হয়ে বসতে গিয়ে গুঙ্গিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মিস্টার সাইফ।'

'ওসব পরে হবে। লোকটার জ্ঞান ফিরে আসার আগেই আমি পুরোটা শুনতে চাই।'

কষ্টেসৃষ্টে সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলেন ভদ্রলোক। 'আমার নাম আহমাদ হোসেন। ব্যাবসায়ী। আর হিগাজি,' মিস্টার ঝামেলার দিকে ইশারা করলেন ভদ্রলোক, 'আমার পার্টনার। ব্যাবসায়িক পার্টনার হিসেবে খুবই জঘন্য লোক হিগাজি। সারাদিন জুয়া খেলে নিজের সব টাকা পয়সা উড়িয়ে দিয়েছিল। পাওনাদারদের চাপে টিকতে না পেরে ওর শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিতে চাইছিল আমার কাছে। আমিও শুনে হাঁপ ছেঁড়ে বাঁচি। এক বাক্যে রাজি হয়ে যাই ওর শেয়ার কিনতে। সন্ধ্যায় ফোন করে বলল, ও এখানেই আছে, আমি যেন টাকাপয়সা নিয়ে চলে আসি।

আমি এসে শুনলাম, ও নাকি ব্যাংকে শেয়ারের কাগজ মর্টগেজ রেখে মোটা অংকের টাকা লোন নিয়েছে। শুনে বললাম, বেশ, তাহলে আমাকে মর্টগেজের কাগজপত্রগুলো দিয়ে দাও, আমি ব্যাংকের লোন শোধ করে বাকি টাকা তোমাকে দিয়ে দেব। তখন হিগাজির আসল রুপটা বেরিয়ে পড়ল। আমাকে টাকাপয়সা রেখে চুপচাপ বেরিয়ে যেতে বলল।

বলাই বাহুল্য, আমি আমল দিলাম না। রুম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইলাম। ও আমাকে বাধা দিতে এল। শুরু হল ধস্তাধস্তি। গায়ের জোরে হিগাজির সাথে পেরে ওঠার কোনো কারণই নেই আমার। তার উপর মাতাল ছিল ও। হাতাহাতির এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম, ওর কোমরে একটা পিস্তল আছে। একটানে ওটা বের করেই গুলী ছুড়লাম। ক্ষীন আশা ছিল, কারো দৃষ্টি আকর্ষন করবে আওয়াজটা। গুলীর শব্দে ভড়কে গিয়ে পিস্তলটা কেড়ে নিয়েই হিগাজি আমার মাথায় আঘাত করে বসে। এই হল ঘটনা।'

'দেখা যাচ্ছে আপনার কৌশলটা পুরোপুরি কাজে লেগেছে।'

'হুম, কিন্তু আপনি ওর সাথে পারলেন কিভাবে। মোষের মত জোর ওর গায়ে।'

'তা আর বলতে!' চোয়ালে একবার স্পর্শ করে বলে উঠল সাইফ। আহমাদ হোসেনের প্রশ্নটা এড়িয়ে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, ওর সেই পিস্তলটা কোথায়?'

'সম্ভবত এখনো ওর কোমরেই গোঁজা আছে।'

সাইফ উঠে গিয়ে জ্ঞানহীন হিগাজির শরীর সার্চ করতেই কোমরে পিস্তলটা খুঁজে পেল। ভাগ্যিস ওর উপর হিগাজি এটা ব্যাবহার করার সুযোগ পায়নি।

এরপর হিগাজির জামা কাপড়ও খুঁজে দেখল। কোটের ভেতরের পকেটে কিছু কাগজপত্র দেখতে পেল ব্যাংকের। সম্ভবত মর্টগেজের ডকুমেন্ট। ওগুলো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সাইফ। আহমাদ হোসেনের দিকে তাকিয়ে বলল,

‘পুলিশকে ইনফর্ম করতে হবে। ব্যাংকের কাগজপত্র পাওয়া গেছে। আপনি পুলিশকে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে কাগজগুলোর মাধ্যমে ব্যাংকের লোন শোধ করে শেয়ারগুলো ছাড়িয়ে আনতে পারবেন।’

মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক।

সাইফ এগিয়ে গিয়ে রিসেপশনে ডায়াল করে বিস্তারিত জানাল। রিসেপশন থেকে জানানো হল এক্ষুনি হোটেল সিকিউরিটি আসছে। দশ মিনিটের মধ্যে পুলিশও চলে আসবে।

সাইফের কথা শেষ হতেই, আহমাদ হোসেন ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

‘মিস্টার সাইফ, আপনি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই না। চাই, শুধু একটা উপকার করার সুযোগ।’ একটা ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক, ‘যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে স্বরণ করবেন, প্লিজ।’

‘নিশ্চয়ই।’ কার্ডটা না দেখেই পকেটে রেখে দিল সাইফ।

মিনিট বিশেক পর পুলিশী ঝামেলা সেরে হোটেলের রিসিপশনে চলে এল সাইফ। একটা গাড়ি ভাড়া করে দিতে বলল। রিসিপশন থেকে কিছুক্ষনের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হল ওকে।

সাইফ লবিতে গিয়ে বসল। তাড়া নেই ওর। সারারাতই পড়ে রয়েছে ওর সামনে। তবে মারাত্মক উৎকণ্ঠা হচ্ছে। জানে না, কী দেখতে পাবে ওই সহস্রাব্দ প্রাচীন পিরামিডের অভ্যন্তরে। পিরামিডটাই খুঁজে পাবে কিনা সেটাই বা কে বলতে পারে?

একটা কফির অর্ডার করল। শেষ হবার আগেই একজন বেয়ারা এসে ওর হাতে একটা চাবি ধরিয়ে দিয়ে গাড়ির নাম্বার বলে গেল। কফি শেষ করে হোটেলের গাড়ি বারান্দায় এসে পড়ল।

‘করছে কী!’ নাম্বার মিলিয়ে গাড়িটা খুঁজে পেতেই খাঁটি বাংলায় অস্ফুটে বলে

উঠল সাইফ।

ঝাঁ চকচকে কালো রঙের একটা ছাদ খোলা কনভার্টিবল দাঁড়িয়ে আছে গর্বিত ভঙ্গিতে। এই গাড়ি নিয়ে মরুভূমিতে চলা মুশকিল। সন্দেহ করতে পারে ভেবে রিসিপশনে ফোরহুইল ড্রাইভের গাড়ির কথা বলেনি সাইফ। শুধু বলেছিল ভাল একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে। গাড়িটা ভাল, তাতে সন্দেহ নেই। একটু বেশিই ভাল আরকি!

যাক, কী আর করার। এটাতেই কাজ চালাতে হবে। দরজা খুলে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল সাইফ।

পরমুহূর্তেই হোটেলের ড্রাইভওয়ে ছেড়ে সাঁ করে বেরিয়ে এল কালো রঙের কনভার্টিবল।

কায়রোর রাজপথে দূরন্ত গতি তুলেছে সাইফ। প্রচুর ট্রাফিক থাকলেও জট পাকিয়ে নেই। মাঝে মধ্যেই গতি সর্বোচ্চ সীমার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে।

অনেক আগে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটা রচনায় পড়েছিল, কায়রো হল এক নিশাচর শহর। কথাটার সত্যতা বুঝতে বেগ পেতে হচ্ছে না ওকে। রাত বাড়ার সাথে সাথে পথে নেমে পড়েছে মানুষজন। বেশিরভাগই টুরিস্ট। দল বেঁধে, জুটি বেঁধে আবার কেউ নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে।

কায়রো শহর পর্যটকদের টানে চুম্বকের মত। টুরিস্টদের আকর্ষনের মূলে রয়েছে পিরামিড, মমি আর নীলনদ। শতাব্দী প্রাচীন মসজিদ আর ইসলামি ঐতিহ্যও কম আকর্ষনীয় নয়।

কায়রোর উপকন্ঠ গিজায় এসে গাড়ি থামাল সাইফ। রাস্তার পাশের একটা দোকান থেকে শক্তিশালী একটা ফ্ল্যাশ লাইট কিনে ফের গাড়িতে উঠে বসল।

প্রায় আধঘন্টা পর সাইফের কনভার্টিবল ঢুকে পড়ল মরুভূমিতে। শীতল মরুভূমি!

হুম, ব্যাপারটা এমন অদ্ভুতই। দিনে যেখানে তাপমাত্রা চল্লিশ ছাড়িয়ে যায়, রাত ঘনালেই সেখানে চুপটি করে হিম নেমে আসে। তাপমাত্রা নেমে যায় দশ ডিগ্রিতে। কখনো কখনো উঁচু উঁচু টিলার মাথায় একটুখানি তুষার!

ব্যাপারটা ঘটে, কারণ এই বিরান সাহারায় তাপ ধরে রাখার মত কিছুই নেই। না গাছপালা, মানুষ, প্রাণী, কিচ্ছু না। শুধু কিছু নিষ্প্রাণ কিছু পাথর। পৃথিবীর তাবৎ মরুভূমির ব্যাকরণ এটাই।

রাতেরবেলা অন্য এক সৌন্দর্য নিয়ে আভির্ভূত হয়েছে সাহারা। আকাশে বড় সড় একটা চাঁদ। বিশাল মরু প্রান্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছে কোমল, পেলব আলো। সেই আলোয় সব কিছুই রহস্যঘেরা। বিশাল মরুতে ততোধিক বিশাল ওই আকাশটার নীচে দাঁড়ালে নিজেকে কতই না ক্ষুদ্র মনে হয়। অনেক দূরে দূরে যে পিটপিটে আলো দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোও। আলোর বিন্দুগুলো বেদুইনদের ক্যারাভান থেকে আসছে। সাহারাতেই এদের বাস।

একটা সময় এসে হারিয়ে গেল সেই আলোগুলোও। ঠিক তখনই সাইফ খেয়াল হল বেশ অনেকটা সময় ধরে একটা ঘোরের মধ্যে গাড়ি চালিয়েছে ও। যদিও ওর অবচেতন মন ঠিক পথেই নিয়ে এসেছে ওকে।

কিন্তু কী ভাবছিল ও? এই মুহূর্তে অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না সাইফ। হয়ত এটাও রহস্যময়ী সাহারার আরেকটা রহস্য। রাতের এক নিঃসঙ্গ আরোহীকে নিয়ে খানিক ছলনা করে নিল!

সতর্কতার সাথে খানাখন্দ এড়িয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে ওকে। সামান্য বেকায়দায় পড়ে গাড়িটা নষ্ট হলে বিরান মরুতে ভোগান্তির চূড়ান্ত হবে।

আরো মিনিট বিশেক পর দুপুরে দেখা সেই টিলার কাছে চলে এল সাইফ। গাড়ি থেকে নেমে দিক ঠিক করে নিল। সালাহউদ্দিনের কথা অনুযায়ী এখান থেকে পৌনে তিনমাইল দক্ষিন পশ্চিম দিকে যেতে হবে। ফোনের কম্পাসে দিক ঠিক করে আবার গাড়িতে উঠল।

প্রথম কয়েক মাইল পথ বেশ ভালই ছিল। যদি ওটাকে পথ বলা যায় আরকি। এরপরও শুরু হল খানা খন্দ। সেই সাথে অসংখ্য ছোট বড় বোল্ডার মিলে জায়গাটাকে সত্যিই দুর্গম করে তুলেছে। তারউপর গাড়িটা মোটেও মরুভূমিতে চলার উপযোগী না। সবমিলিয়ে যথেষ্টই বেগ পেতে হল ওকে আড়াই মাইল পথ আসতে। এরপর একটা গর্তে পড়ে গাড়ির অ্যাক্সেলে ভাঙ্গার উপক্রম হতেই আর ঝুঁকি নিতে চাইল না সাইফ। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। শত হলেও মরুভূমিতে গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত নয় ও। অন্তত নাসের বিন ইউসুফ কিংবা মোবারকের মত তো নয়ই। বাকি পথটা হেঁটে যাওয়াই ঠিক করল।

বোল্ডারের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে পথ করে দশ মিনিট হেঁটে ওর বিশ্বাস জন্মাল, কাঙ্ক্ষিত জায়গাতে পৌঁছে গেছে। যদিও এখন পর্যন্ত আশা জাগানিয়া কিছুই দেখতে পায়নি ও। আশপাশটা একই রকম লাগছে। কোনো বিশেষ পাথরের স্তুপ দৃষ্টি আকর্ষন করতে ব্যর্থ হল ওর। এখন বাধ্য হয়েই ফ্ল্যাশলাইটটা ব্যাবহার করতে হবে। এটা কিনেছিল পিরামিডের অভ্যন্তরে ব্যাবহারের জন্য। এই ফাঁকা জায়গায় অনেক দূর পর্যন্ত আলো দেখা যাবে। এজন্য পুরো পথটাও ও এসেছে গাড়ির হেডলাইট অফ করে, চাঁদের আলোর ভরসায়। এখন উপায় নেই। সাইফ ফ্ল্যাশলাইট বের করে জ্বালল।

শক্তিশালী আলো সুড়ঙ্গ চিড়ে ফুঁড়ে পথ করে নিল অন্ধকারে। কয়েক পা হেঁটে গিয়ে গিয়ে আলো ফেলে ফেলে দেখছে। বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে হঠাৎ একটা পাথরের স্তুপ দৃষ্টি আকর্ষন করল ওর। অন্য স্তুপগুলোর সাথে খুব কমই পার্থক্য আছে। সত্যি বলতে আগে থেকে না জানলে সন্দেহও হত না। সামনে এগিয়ে গেল সাইফ।

হুম, এই স্তুপের পাথরগুলো গভীর মনোযোগে দেখলে একটা মেকিভাব ধরা পড়ে চোখে। পাথরগুলোকে যেন একটা শেপ দেয়া হয়েছিল কোনোকালে। বেশ বড় সড় স্তুপ, এরপরও খোঁজাখুঁজি ছাড়াই স্তুপের গায়ে কোনোমতে একটা মানুষ গলার মত গর্ত দেখতে পেল সাইফ।

গর্তটা দেখতে পাবার সাথে সাথেই বুকের ধুকপুকানি বেড়ে গেল। সব মিলে যাচ্ছে! তারমানে বাকিটাও না মেলার কারণ নেই। ট্রেজার! মনে মনে আল্লাহর নাম নিয়ে গর্তে মাথা গলাল সাইফ।

মাটি থেকে চেম্বারের মেঝে ফুট দশেক নীচে। নিখুঁত ভঙ্গিমায় লাফ দিল। কোনো ঝামেলা ছাড়াই মসৃণভাবে মাটিতে পা রাখল সাইফ। কোমরে গোঁজা ফ্ল্যাশলাইটটা বের করে আলো ফেলল চারপাশে।

নাসের বিন ইউসুফের বর্ননা অনুযায়ী রুমটা দশ বাই দশ। চারদিকেই। যেন একটা বাক্সে ঢুকে পড়েছে ও। দেয়ালের গায়ে প্রচুর চিত্র আঁকা হয়েছে পাথর কুঁদে। প্রাচীন মিশরের দেবদেবী এরা। স্ফিংস, শেয়ালমুখো আনুবিস, অমঙ্গলের দেবতা আমন রা, পরকালের দেবতা অসিরিস, হোরাসসহ আরো কিছু প্রসিদ্ধ দেবতাকে শনাক্ত করতে পারল সাইফ। এছাড়াও রয়েছে অনেক আঁকিবুকি। ওগুলো হায়ারোগ্লিফিক। সাইফ হায়ারোগ্লিফিক জানে না, সেজন্য ওগুলো নিয়ে মাথাও ঘামাল না। এখন ওকে লিভারটা খুঁজে বের করতে হবে।

নাসের বিন ইউসুফ শুধু উল্লেখ করেছিলেন এই চেম্বারে একটা লিভার আছে। কিন্তু সেটা কোথায়, বা কিভাবে খুঁজে পেতে হবে সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। সাইফের ধারণা, নাসের বিন ইউসুফ একটা অদৃশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন ওর প্রতি। অর্থাৎ কর্নেল যাকে পাঠাবেন তার বুদ্ধির পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন।

সাইফ আবারও রুমটা পর্যবেক্ষন করে দেখল। নাহ, বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। সব একই রকম। হায়ারোগ্লিফিকের নকশা কাটা দেয়ালের কোথাও যদি ছোট্ট কোনো লিভার থাকেও, সেটা খুঁজে পাওয়া মোটেও সহজ কিছু না।

কৌশল পাল্টাল সাইফ। ফ্ল্যাশলাইটের হ্যান্ডেল দাঁতে চেপে ধরে দেয়ালের গায়ে হাত বোলাতে লাগল আলতো করে। এইভাবে দুইদিকের দেয়াল হাতড়েও কোনো লাভ হল না। অস্বাভাবিক কিছু অনুভূত হয়নি হাতে। এবার উত্তর দিকের দেয়ালে হাত বোলাতে শুরু করল সাইফ। এবার অবশ্য শিকে ছিঁড়ল

ওর ভাগ্যে। তবে সেটা হাত বোলানোর কারণে নয়। একেবারে কাছাকাছি থাকায় চোখে ধরা পড়ল। দেয়ালে খোঁদাই করা একটা আনুবিসের পা অন্যটার তুলনায় কিছুটা লম্বা। ভালমত পর্যবেক্ষন করে সাইফের বিশ্বাস জন্মাল, ও যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে।

সাইফ বাড়তি অংশটায় চাপ দিল, কিছুই ঘটল না। এবার আরো জোরে, এবার ঘটল। অংশটা দেবে গেল খানিকটা। পরমুহূর্তেই চেম্বার জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘড়ঘড়ে একটা স্নায়ুক্ষয়ী আওয়াজ। বদ্ধ কামরায় প্রতিধ্বনি তুলছে।

একসময় শব্দটা থেমে গেল। যেন ঝড়ের পরের নীরবতা। খেয়াল করে অবাক হয়ে গেল সাইফ, ওর হাত কাঁপছে! উত্তেজনায় ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে আছে স্নায়ু। বড় করে দম নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল। চারপাশে আলো ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। ভীতিকর ছায়া পড়ছে এবড়ো খেবড়ো দেয়ালে। যেন অশরীরী কিছু একটা ঘাপটি মেরে রয়েছে পরের বাঁকে। যত আজেবাজে কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগই মমির অভিশাপ টাইপের! তবে তুতানখামেনের মমির আবিষ্কারের সাথে জড়িত সবাই যে রহস্যময় সব কারণে মারা পড়েছে, এটা একটা সার্বজনীন সত্য। এর পেছনে নিয়ামক হিসেবে ঠিক কী কাজ করেছে সাইফ জানে না, তবে এই সহস্রাব্দ প্রাচীন পিরামিডের ছায়া ছায়া সুড়ঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে একটা শব্দই মনে পড়ল, অভিশাপ!

কতক্ষন হেঁটেছে ঠাহর করতে পারেনি সাইফ। একসময় পৌঁছে গেল টানেলের অপর প্রান্তে। এখানেও যেন হুবহু সেই দরজাটাই বসিয়ে দেয়া হয়েছে। চারপাশের দেয়ালচিত্রেও প্রচুর মিল। সূত্র জানা থাকায় এবার বেগ পেতে হল না সাইফকে। দু' মিনিটের মাথায় খুঁজে বের করে ফেলল লিভার। চাপ দিল। ঘটল পুনরাবৃত্তি।

ঢুকে পড়ল সাইফ পিরামিডের মূল চেম্বারে। কাঁপুনিটা বোধহয় সাথে সাথে বেড়ে গেল। কাঁপা কাঁপা আলোয় ঘাড় ঘুরিয়ে রুমটা দেখে নিল সাইফ। বেশ

বড় কামরা। অন্তত ত্রিশ বাই চল্লিশ তো হবেই। আর ঠিক মাঝখানেই... ঠিক মাঝখানেই রাখা একসাড়িতে পাঁচটা সারকোফেগাস!

নাসের বিন ইউসুফের ইমেইলটা স্বরণ করার চেষ্টা করল সাইফ। ঠিক এইজায়গাটাতে এসে কী বলেছিল নাসের বিন ইউসুফ?

“পকেট থেকে লাইটার বের করলাম। জ্বালবার আগে কয়েকমুহুর্ত সময় নিয়েছিলাম নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে।”

সাইফের লাইটার জ্বালবার ঝামেলা নেই। তবুও নিজেকে চরম সত্যটার মুখোমুখি দাঁড় করাতে সাহসে কুলাচ্ছে না। মানসিকভাবে কিছুটা প্রস্তুতি নেবার জন্য চোখ ফিরিয়ে নিল সারকোফেগাস থেকে। ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বেলে আবারও রুমটা দেখায় মন দিল। আসলে ভান করছে। মনটা বন্দি হয়ে পড়েছে ওই পাঁচটা বাক্সে।

এমন সময় আশ্চর্য একটা ঘটনা ঘটল। ঘটনার আকস্মিকতায় হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা পড়েই যাচ্ছিল।

একটু আগে সাইফ যেখানে আলো ফেলেছিল ঠিক সেখান থেকেই কে যেন ওর দিকেই আলো ফেলল!

পুরোপুরি সতর্ক হয়ে গেল সাইফ। তাহলে কী ওর এখানে আসার উদ্দেশ্য কারো কাছে ফাঁস হয়ে গেছে? কেউ আগে থেকেই এখানে ঢুকে বসে আছে? কে হতে পারে? একমাত্র সালাহউদ্দিন ছাড়া তো আর কেউ জানে না এই পিরামিডের খবর।

সাথে কোনো অস্ত্র নেই বলে খুবই অসহায় মনে হল সাইফের নিজেকে। একেবারে ভরা মাঠে নগ্ন হয়ে যাবার মত অনভূতি।

চিতার মত নিঃশব্দ পদক্ষেপে সামনে এগোল কয়েক পা। চারদিকে নিচ্ছিদ্র আধার। ঘটনাটা ঘটার সাথে সাথেই লাইট অফ করে দিয়েছে সাইফ। কিন্তু

শত্রুর মুখোমুখি হতে লাইট জ্বালবার বিকল্প নেই। সমস্ত শরীর টানটান করে লাইট জ্বালল। যেকোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি।

লাইট জ্বালবার সাথে সাথেই নিজেকে সাইফের পৃথিবীর সবচাইতে বড় গাধা মনে হল। উতপ্ত মস্তিষ্ক যে তিলকে আস্ত তালগাছ বানিয়ে দিতে পারে সেটাই এইমাত্র হাতে কলমে উপলব্ধি করতে পারল।

পিরামিড, মমি এসব ব্যাপারে মিশরে আসার সময় প্লেনেই কিছুটা পড়াশোনা করে নিয়েছে। আগেই বোঝা উচিৎ ছিল। উত্তেজনায় সব গুলিয়ে খেয়ে ফেলেছে, নয়ত পিলেটা এভাবে চমকে উঠত না।

ব্যাপারটা হল, প্রাচীন মিশরীয়রা পিরামিডের মূল চেম্বার আলোকিত করবার জন্য রিফ্লেক্টর পদ্ধতি ব্যাবহার করত। বেশ কিছু আয়না এমনভাবে ফিট করত যাতে করে সূর্যের আলো একটা থেকে আরেকটা আয়নায় প্রতিফলিত হতে হতে মূল চেম্বার আলোকিত করে। একটু আগে ওর ফ্ল্যাশলাইটের আলোও ওইরকম একটা রিফ্লেক্টরে গিয়ে পড়েছিল। আর তাতেই... আপন মনেই হাসল সাইফ। নাহ, এবার সত্যটার মুখোমুখি হতে হবে। নইলে না জানি আরো কী কী কান্ড চাক্ষুস করতে হবে। দেখা গেল চোখের সামনে মমি উঠে দাঁড়িয়েছে!

সাইফ পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সারকোফেগাসগুলোর দিকে। সর্ব ডানের বাক্সটার সামনে এসে দাঁড়াল। আগেই মাঝের কফিন খুলে কাপড় প্যাঁচানো শুকনো লাশ দেখার কোনো আগ্রহ নেই ওর।

বাক্সটার সামনে দাঁড়িয়ে যেন নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক আওয়াজ স্পষ্টই শুনতে পেল সাইফ। নিরেট নিস্তব্ধতা গোটা কামরায়।

বিসমিল্লাহ বলে ডালাটা উঁচু করে ফেলল সাইফ।

সাথে সাথেই বুকের রক্ত প্রবলভাবে ছলকে উঠল। কয়েকমুহূর্তের জন্য শ্বাস নিতে ভুলে গেল। যেন পাথরের একটা মুর্তি।

সামান্য পরই সংবিৎ ফিরে পেতেই একে একে বাকি কফিন তিনটেও খুলে ফেলল। প্রতিবারই বাক্সগুলো খোলার সময় একটু একটু করে রক্তে এড্রেনালিন ছড়িয়ে পড়েছে। প্রবল বেগে ছুটে যাচ্ছে শিরা উপশিরায়। একসময় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সাইফ।

চারটা বাক্সই সম্পুর্ন খালি।

কিছুই নেই ভেতরে।

কিচ্ছু না!

কতগুলো মুহুর্ত স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল সাইফ তার কোনো হিসেব নেই ওর কাছে। প্রতিটা সেকেন্ড বুকের মধ্যে হাহাকার আরো বাড়িয়ে দিয়ে গেল। চিন্তাশক্তি লোপ পেল সাময়িকের জন্য।

একটা সময় নিজেকে ফিরে পেল সাইফ। মাথা ঝাঁকি দিয়ে যেন দুঃস্বপ্নটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল।

পায়ে পায়ে এবার এগিয়ে গেল মাঝের মমির কফিনের দিকে। উঁচু করে ধরল ডালাটা। সাথে সাথে আরেকটা বিস্ময় ঝাঁকি দিয়ে গেল আবারও ওকে।

চুপচাপ কফিনে শুয়ে আছে লিনেন কাপড়ে আচ্ছাদিত একটা মমি। মুখের জায়গায় একটা মুখোশ। বাকি দেহটা কোনো এককালে সাদা কাপড়ে জড়ানো থাকলেও কালের পরিক্রমায় সেটা এখন হলদেটে। বোটকা একটা গন্ধ ঝাপটা মেরে গেল নাকে। দীর্ঘদিন বদ্ধ থাকায় মৃত মানুষের স্বাভাবিক গন্ধ আর কেমিকেলের গন্ধ মিলে উৎকট একটা গন্ধ তৈরি করেছে।

বেশ অবাক হল সাইফ। বুঝতেই পারছে ট্রেজার চলে গেছে অজ্ঞাত কারো হাতে। আসলেই অজ্ঞাত? নাকি ওর পরিচিত কেউ?

এখন প্রশ্নটা হল, ট্রেজার যেই নিয়ে থাকুক, সে মমি ফেলে যাবে কেন। মমিও তো আকাশ ছোঁয়া দামে বিকোয়। নাকি ট্রেজারের পরিমাণ দেখে আর উটকো

ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। হতে পারে। ওই ট্রেজার আসলেই অমূল্য। এই মমি তাঁর কাছে কিছুই না। কিন্তু লোভ এমন একটা জিনিস, কাউকে পেয়ে বসলে সাতরাজার ধন হাতে রেখেও মমিকে ছাড়তে চাইবে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাইফ। আর কিছু ভেবে লাভ নেই। পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে ও। কালই ফিরে যাবে দেশে। কর্নেলের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে বলবে, 'আমি পারিনি।'

কফিনের ডালাটা বন্ধ করে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েও থেমে গেল সাইফ। একটা ব্যাপারে খটকা লেগেছে। ডালাটা বন্ধ করার আগ মুহূর্তে কি কফিনের ভেতর কিছু দেখতে পেয়েছিল ও?

আবারও ডালাটা উঁচু করে ধরল। ভাল করে আলো ফেলতেই নজরে এল জিনিসটা।

একটা কাগজ। মমির শরীরে প্যাঁচানো লিনেনের ভাঁজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। দেখতে প্যাপিরাসে লেখা প্রাচীন পার্চমেন্টের মত লাগছে না। হাল আমলের কাগজ। অবশ্য বেশ পুরনো। হলদেটে হয়ে আছে লিনেনের মতই। এজন্যই প্রথম নজরে ধরা পড়েনি। কাগজের টুকরোটা ধরে খুব সাবধানে বের করে আনল সাইফ।

ওর ধারণাই ঠিক। খুব বেশিদিন আগের লেখা নয়। অন্তত এই মমি কিংবা সারকোফেগাসের আমলে তো নয়ই। আস্তে করে ভাঁজ খুলল কাগজটার।

এটা একটা চিরকুট। চিরকুটটাতে অদ্ভুত একটা কথা লেখা। লেখাটা পড়ে এই পিরামিডে ঢোকার পর তৃতীয়বারের মত বিস্ময়ের চূড়ান্তে পৌঁছে গেল সাইফ। লেখটার বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ

"একটা ঘোড়া একলাফে পনেরো হাত যেতে পারলে দুই লাফে কতদূর যেতে পারে? তুমিও এগিয়ে যাও অতটা।"

মানে কী! মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। নাসের বিন ইউসুফের ইমেইলের একটা লাইন মনে পড়ে গেল সাইফের।

"ট্রেজারগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য আমি কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি।"

এটাই তাহলে সেই নিরাপত্তা ব্যাবস্থা। সাইফের বুঝতে বেগ পেতে হল না, এই চিরকুটের লেখক কে। যদিও চিরকুটের কোথাও ট্রেজার শব্দটা উল্লেখ করা হয়নি তবুও সাইফ নিশ্চিত নাসের বিন ইউসুফ ট্রেজারগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছিলেন। যাতে পিরামিডটা কেউ খুঁজে পেলেও ট্রেজারগুলো না পায়। আর সেগুলো খুঁজে পাবার জন্য এই ধাঁধাটা লিখে রেখে গেছেন। আগে থেকে জানা না থাকলে আশ্চর্য হলেও একপর্যায়ে বাজে প্রলাপ বলে যে কেউ ছুঁড়ে ফেলে দিত কাগজটা। সাইফ নিজেও দিত। কিন্তু ও এখন জানে, এই কাগজেই লুকিয়ে আছে সাত রাজার ধন খুঁজে পাবার চাবিকাঠি।

পুরো ব্যাপারটা ধারণা করতে পারল সাইফ। নাসের বিন ইউসুফ তাঁর ইমেইলে অনেক কিছুই গোপন করে গেছেন। মূলত তিনি এই পিরামিডে একবার নয়, কমপক্ষে দুবার এসেছিলেন। দ্বিতীয়বার এসেছিলেন ট্রেজারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য। তবে সেটা কবে জানে না সাইফ। সম্ভবত প্রথমবার আসার কিছুদিন পরই। তখন এসে তিনি ট্রেজার লুকিয়ে ফেলেন কোথাও। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এখানে হয়ত আর কোনোদিন আসা নাও হতে পারে তার। সেজন্য তিনি তার পরবর্তী উত্তরসূরির জন্য একটা ধাঁধা রেখে গেলেন। যেটার মাধ্যমে ট্রেজার খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর পিরামিডটা খুঁজে পাবার জন্য সেই টিলার মাথায় অদ্ভুত কায়দায় পাথর সেট করলেন।

হুম, জিনিয়াস! ভাবল সাইফ।

এবার ধাঁধাটা নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন। আবারও পড়ে দেখল চিরকুটটা

"একটা ঘোড়া একলাফে পনেরো হাত যেতে পারলে দুই লাফে কতদূর যেতে

পারে? তুমিও এগিয়ে যাও অতটা।”

প্রথমবার পড়ার সময় মস্তিষ্ক উত্তপ্ত ছিল, এজন্য ধাঁধার অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারেনি। এবার ঠান্ডা মাথায় ধাঁধাটা পড়ে বুঝতে পারল অসম্ভব একটা কথা বলা হয়েছে এখানে।

স্বাভাবিক নিয়মে একটা ঘোড়ার এক লাফে পনেরো হাত দুরত্ব অতিক্রম করার কথা না। যদি ধরেও নেয়া যায়, হেঁয়ালির জন্য নাসের বিন ইউস্সুফ এটা লিখেছেন তাহলেও সমস্যা আছে। ঘোড়াটা যদি একলাফে পনেরো হাত যেতে পারে তাহলে দুই লাফে ত্রিশ হাত যাবার কথা। সমস্যাটাও ওখানেই। সাধারনত এক হাতকে যদি একফুট ধরা হয় তাহলে হয় ত্রিশ ফুট। অর্থাৎ ত্রিশ ফুট সামনে এগিয়ে যেতে বলা হয়েছে কফিন থেকে। কিন্তু সেটা অসম্ভব। কারণ এখান থেকে সামনের দেয়ালের দুরত্ব সর্বোচ্চ বিশ ফুট। ত্রিশ ফুট যেতে চাইলে দেয়াল ফুঁড়ে যেতে হবে। আচ্ছা, এখানে কি সেই ইঙ্গিতই করা হয়েছে? অর্থাৎ দেয়ালের ঠিক ওপাশেই লুকনো আছে ট্রেজার?

সাইফের মন মানতে চাইল না এই সাদামাটা যুক্তি। ব্যাপারটা এত সহজ হবে না। চিরকুটটা পড়লে এই চিন্তাটাই যে কারও মাথায় আসবে আগে। সেক্ষেত্রে নাসের বিন ইউস্সুফের এতটা হেঁয়ালি করবার প্রয়োজন ছিল না।

একটা দুর্বল আইডিয়া মাথায় খেলে গেল। অনেকটা “ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরা” টাইপ। কিন্তু একেবারে কিছু না করার চাইতে অন্তত কিছু তো করা ভাল। সাইফ কফিন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

আজকালকার আধুনিক অনেক ভবনেই দেখা যায় আগন্তুক দরজার সামনে দাঁড়ালেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাচ্ছে সেটা। দরজার সামনে এক ধরনের প্রেশারপ্যাড থাকে। কেউ প্রেশারপ্যাডের উপরে দাঁড়ালে চাপ লেগে মেকানিজম চালু হয়ে দরজা খুলে যায়। প্রাচীন মিশরীয়রা প্রযুক্তিতে অনেক অ্যাডভান্স ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই পিরামিডে ঢোকার দরজাগুলোতে যে

ধরনের মেকানিজম ব্যাবহার করা হয়েছে সেটাই সাক্ষ্য দেয় তাদের উন্নত সভ্যতার। সেই হিসেবে চারহাজার বছর আগে প্রেশারপ্যাড আবিষ্কার হওয়া বিচিত্র কিছু না। সাইফের মনে ক্ষীন একটু আশা বেঁচে আছে, এখানে হয়ত ওই ধরনের কোনো প্রযুক্তি ব্যাবহার করা হয়েছে। সামনে এগিয়ে গেলে কোনো প্রেশারপ্যাডে চাপ লেগে স্বয়ংক্রীয়ভাবে খুলে যাবে গোপন কোনো দরজা।

সাইফ ধীর পায়ে এগিয়ে গেল, একেবারে দেয়াল পর্যন্ত।

ঘড়ঘড় শব্দ করে আগের মত একটা দরজা খুলে যাবে-আশা করেছিল সাইফ। কিন্তু রুমের কোথায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না দেখে আশাহত হল না তেমন। আগেই জানত, এটাও হবার নয়। এত সহজেই ট্রেজার বের করা গেলে সেগুলো লুকোনো কোনো অর্থই হয় না। নাসের বিন ইউস্থফ তার মেইলে কর্নেলের উদ্দেশ্যে শুধু শুধু বলেননি, "ট্রেজারগুলো খুঁজে পেতে হলে বুদ্ধিমান কারও প্রয়োজন পড়বে তোমার"।

দেয়ালের কাছ থেকে সরে এসে একটা পাথুরে বেদির উপরে বসে ধাঁধাটা নিয়ে ভাবতে বসল সাইফ। পরবর্তী আধঘন্টা ও ভুলে থাকল ও এই মুহুর্তে সহস্রাব্দ প্রাচীন এক অদ্ভুতুড়ে পিরামিডের অভ্যন্তরে বসে আছে।

এক সময় ফ্ল্যাশলাইটের আলো টিপ টিপ করে দুর্বলতা প্রকাশ করলে সাইফ বুঝতে পারল, এবার যাবার সময় হয়েছে। ফ্ল্যাশলাইট নিভে গেলে বেশ ভালই বিপদ হবে।

শেষবারের মত পুরো চেম্বারে চোখ বুলিয়ে চিরকুটটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল। দরজা দুটো আগের মত বন্ধ করে পিরামিড থেকে বেরিয়ে এল। ফিরে চলল হোটেলের উদ্দেশ্যে।

হতাশা কিছুটা হলেও কমেছে। একেবারে খালিহাতে ফিরতে হয়নি। অন্তত একটা সূত্র পেয়েছে কাজ করবার জন্য। এখন এই ধাঁধার সূত্র ধরেই এগোতে হবে ওকে।

হোটেলে যখন ফিরল তার বেশ আগেই মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে।

পাঁচ

হোটেলে ফিরে আবারও শাওয়ার নিয়েছে সাইফ। বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিয়েও লাভ হয়নি। ঘুম আসেনি। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বারান্দায় এসে রকিং চেয়ারে বসে দুলছে। চোখ বন্ধ করে ধাঁধাটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে। সামনে বিশাল নীলনদ থেকে শীতল বাতাসের এক একটা ঝাপটা গায়ে চমৎকার আরামদায়ক পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। ঘুম চলে আসছে। এখানেই বাচ্চাদের মত দোল খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়বে বলে ঠিক করল সাইফ।

প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, এমন সময় কলিংবেলের বেরসিক আওয়াজে তন্দ্রা কেটে গেল সাইফের। একই সাথে বিস্মিত এবং বিরক্ত হল ও। ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেছে। রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখল পৌনে দুটো বাজে।

এর রাতে আবার কে এল?

চোখ ডলতে ডলতে দরজার সামনে চলে এল সাইফ। কি-হোলে চোখ রাখতেই রুম সার্ভিসের ড্রেস পরা একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। জরুরী কোনো মেসেজ হতে পারে ভেবে দরজা খুলে দিল সাইফ। কিন্তু এরপর যা ঘটল তাঁর জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না ও।

দরজা খোলার সাথে সাথেই তিনজন লোক ওকে ঠেলে রুমে ঢুকে পড়ল। সামনের জনের হাতের পিস্তলটা লোলুপ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

রুম সার্ভিসের ড্রেস পরা লোকটা দরজা লাগিয়ে দিল। তৃতীয় ব্যক্তিকে এদের দলনেতা মনে হচ্ছে। সে পেছনে হাত বেঁধে বেশ আয়েশী ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে পিস্তলধারীর পাশে। তাকে দেখেই সবচাইতে বেশি অবাক হয়েছে সাইফ। এই লোকটার পাশে বসেই গত কয়েকদিন ধরে মরুভূমি চষে ফেলেছে ও।

‘অবাক হবার কিছু নেই মি. সাইফ। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। কাউকে বিশ্বাস করতে নেই!’ হাসতে হাসতে বলল ছোট্ট দলটার নেতা মোবারক সিদ্দিকি।

সাইফ কিছু বলল না। একরাশ ঘৃনা নিয়ে তাকিয়ে আছে।

‘যাকগে, এবার কাজের কথা আসা যাক।’ আবার বলে উঠল মোবারক। ‘আপনি এখন আমাদের সাথে এক জায়গায় বেড়াতে যাবেন।’

সাইফ ভেতরে ভেতরে তৈরি হয়ে গেল। রুমের পুরো অবস্থাটা মাথায় নিয়ে নিয়েছে। ঝড়ের বেগে চলতে শুরু করেছে ওর মস্তিষ্ক। শত্রুর প্রতিটা নড়াচড়া যাচাই করে দেখছে। একটা সুযোগের অপেক্ষা। তবে মোবারকের পরের কথাতেই পরিকল্পনাটা ঝেরে ফেলতে হল।

‘কোনো রকম বেগড়বাই করার চেষ্টা করবেন না মি. সাইফ। তাহলে আপনার কিছু হোক বা না হোক মিস সুমাইয়ার কী হবে বলা যাচ্ছে না।’ আবারও কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল মোবারকের চেহারায়।

‘সুমাইয়াকে কী করেছো তোমরা?’ ভারী মেঘের মত থমথমে শোনাল সাইফের গলা।

‘এখনো কিছু করিনি, তবে করা হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে আপনার উপর। ভালয় ভালয় আমাদের সাথে গেলেই কিছু করা হবে না তাকে।' একটু বিরতি,'আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা চেক করে দেখেছি। আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের ভাল ধারণা আছে। সেজন্যই কোনো ঝুঁকি নেইনি। আশা করি ব্যাপারটা বুঝবেন?’ বিদ্রূপাত্মক মোবারকের গলা।

“আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা চেক করে দেখেছি।” কথাটা সাইফের মস্তিষ্কে

বেশ ভালভাবেই খোঁচা দিয়েছে। এরা কারা? এই মিশর থেকে বাংলাদেশের এক এক্স আর্মি অফিসারের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবার মত ক্ষমতা এরা কোথায় পেল। মোবারকের পরিচয়ই বা কী? সাধারণ এক গাইড কিভাবে অস্ত্র হাতে ফাইভস্টার হোটেলে ঢুকে পড়বার মত সাহস পায়? এদের পরিচয় যাই হোক না কেন, এদের হাত বেশ লম্বা।

আরো কিছু হয়ত ভাবত সাইফ। ছেদ পড়ল মোবারকের গলায়। 'আপনি এখন আমাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে যাবেন। হোটেল সিকিউরিটির দৃষ্টি আকর্ষনের কোনো চেষ্টা যেন করা না হয়।'

সাইফ কিছু বলল না। এদের সাথে আপাতত ঝামেলায় জড়ানোর ইচ্ছা নেই। এদের আসল পরিচয় জানা জরুরী। তার চাইতেও বেশি জরুরী স্যমাইয়াকে উদ্ধার করা। তবুও শেষবারের মত একটা প্রশ্ন করল, 'কী চাও তোমরা?'

হেসে উঠল মোবারক। 'আপনি বোকা, এটা আমাদের বিশ্বাস করতে বলবেন না। আপনি ঠিকই জানেন কী চাই আমরা। যাকগে, অনেক খোশগল্প হল, নাও, গো অ্যাহেড।'

সাথে সাথে পিস্তলধারী ওর পাশে চলে এল। পিস্তলটা কোটের পকেটে ভরে ভেতর থেকেই ওর দিকে তাক করে রাখল।

হাসি চেপে সামনে এগোলো সাইফ। কোটের পকেট থেকে পিস্তল ধরে রাখাটা তেমন কার্যকর কোনো পদ্ধতি না, প্রথমবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে দ্বিতীয়বার গুলী করার জন্য পকেট থেকে পিস্তল বের করবার আগেই জান বেরিয়ে যাবার সম্ভবনা আছে, যদি প্রতিপক্ষ হয় সাইফের মত কোনো কমান্ডো।

রুম থেকে বেরিয়ে লিফটের দিকে এগোলো ওরা। পাশাপাশি পিস্তলধারী আর সাইফ। পেছন পেছন বাকি দুজন। কারো দেখে বোঝার উপায় নেই এদের মধ্যে আসলে একজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।

হোটেলের লবিতে লোকজন নেহায়েত কম না। এই ধরনের হোটেলে সারারাতই মানুষজনের আনাগোনা থাকে।

লবি পার হয়ে ড্রাইভওয়েতে চলে এল ওরা। মোবারকের সেই ল্যান্ড রোভারটাই পার্ক করা। সেদিকেই নিয়ে গেল ওরা ওকে। মোবারক দু'পা এগিয়ে গিয়ে গাড়ির পেছনের দরজা খুলে ইশারা করল ভেতরে ঢুকে পড়ার।

গাড়িতে ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে থেমে দাঁড়াল সাইফ।

'স্যুমাইয়া কিংবা ওর বাবার যদি কিছু হয়, আমি তোমাকে ছাড়ব না, মোবারক। প্রয়োজনে পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করব তোমাকে। কথাটা মাথায় ভাল মত ঢুকিয়ে নাও।' হিম শীতল সাইফের কন্ঠ। কথাটা বলেই আর দেরী করল না, উঠে পড়ল গাড়িতে।

সবাই উঠে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করল।

গত কয়দিন ধরে একটু একটু করে কায়রো শহরের ম্যাপ মোটামুটি মুখস্ত করে ফেলেছে সাইফ। কাজেই কিচ্ছুক্ষন যেতেই ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে একটা ধারণা করতে পারল।

কায়রো শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে নীলনদ। যেন পুরো শহরটাকে দু ভাগ করেছে। এক অংশ থেকে অন্য অংশে যাবার জন্য বেশ কয়েকটা ব্রীজ রয়েছে। সাইফের হোটেল নীল হিলটনও একেবারে নীল ঘেষে। ওদের গাড়িটা তাহরীর স্কয়ার হয়ে "৬ অক্টোবর" ব্রীজে উঠল। ব্রীজ পার হয়েই বাঁ দিকে মোড় নিল গাড়ি। অবাক হল সাইফ, কারণ এখন যেদিকে ওরা যাচ্ছে তাতে করে "৬ অক্টোবর" ব্রীজ দিয়ে পার না হয়ে "কাসর আল নীল" ব্রীজ দিয়ে নদী পার হওয়া অনেক সহজ ছিল। বেশ অনেকটা পথ শুধু শুধু ঘুরেছে ওরা। ব্যাটাদের কান্ড দেখে কৌতুক অনুভব করল সাইফ। ওরা চাইছে অযথা ঘোরাঘুরি করে সাইফকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিতে, যেন ও ধারণা করতে না পারে ওকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিসের জন্য এত লুকোচুরি?

বেশ কিছুক্ষন পর চিড়িয়াখানা দেখে বুঝতে পারল ওরা এখন গিজার কাছাকাছি চলে এসেছে। বাড়িঘর পাতলা হয়ে আসছে।

আচমকাই একটা দোতলা বাড়ির সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল ল্যান্ড রোভারটা। সাইফকে বেরোতে ইশারা করল মোবারক। পিস্তলধারী গাড়িতে বসেই পকেট থেকে বের করে পিস্তলটা ওর দিকে তাক করে রেখেছিল। এখন সেটা নাচিয়ে ভয় দেখাবার প্রয়াস পেল।

বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল সাইফ। ভেতরে ঢোকার আগে গেটের মুখে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেয়েছিল। অন্ধকারে লেখাগুলো পড়তে পারেনি।

বেশ বড়সড় একটা রুমে এসে দাঁড়াল ওরা। বাড়িতে ঢুকতেই এই রুম। এই বাড়ির প্যার্টানটা ঠিক আবাসিক বাড়ির মত না। যেন একটা অফিস। এই রুমটাও অফিসের আদলেই সাজানো। একটা ফাইল কেবিনেট, আর র্যাক দেখা যাচ্ছে। রুমের মাঝখানে বেশ বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। এপাশে দুটো সাধারন আর ওপাশে একটা স্যুইভ্যেল চেয়ার। ওপাশের চেয়ারটাতে একজন মানুষ বসে আছে। বয়স চল্লিশের কোঠায়। স্বাস্থ্য তেমন একটা ভাল না। চোয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তবে চেহারার নিষ্ঠুরভাবটা বলে দিচ্ছে এই লোক গায়ে জোর রাখে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এই-ই নাটের গুরু। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেল সাইফ। লোকটাকে কেন যেন ওর চেনা চেনা মনে হচ্ছে। যদিও তা হবার নয়। কায়রোয় যতদিন ধরে আছে তাঁর মধ্যে একবারও যে ও লোকটাকে দেখেনি এব্যাপারে নিঃসন্দেহ সাইফ।

'ওয়েলকাম, মি.সাইফ। আমার লোকেরা আপনার সাথে খারাপ ব্যাবহার করেনি তো?' খুশি খুশি গলায় বলল চেয়ারে বসা লোকটা।

'এসবের মানে কী?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল সাইফ।

'মানেটা তো এতক্ষনে বুঝে ফেলার কথা আপনার। আমি তো অন্তত তোমাকে বেশ ভালই বুদ্ধিমান মনে করতাম!'

'ভাড়ামো না করে সোজাসাপ্টা জবাব দাও। স্মমাইয়া আর তার বাবাকে কিডন্যাপ করেছো কেন?'

'আপনাকে টাইট দিতে স্মমাইয়া একাই যথেষ্ট। শুধু শুধু বুড়োকে ধরে ঝামেলা পাকাব কেন? তবে যেন পুলিশকে খবর না দেয় সেজন্য কিছুটা ভয় দেখানো হয়েছে তাকে। তেমন কিছু না, করিম বোধহয় বেশি জোরে মারেনি, তাই না?' পাশে দাঁড়ানো পিস্তলধারীর দিকে তাকিয়ে কৌতুক করল লোকটা।

অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল সাইফের।

আবারও লোকটা কথার খেই ধরল। এবার সম্বোধন পাল্টে বলল, 'সাইফ, আমাদের ট্রেজার চাই। ওটা দিয়ে দিলেই তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে।'

সাইফ আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিল এরা কী চায়। তবে ট্রেজারের খবর এরা কিভাবে পেল সেটা এক রহস্য।

'তোমাদের পরিচয় জানতে পারি কি?'

'হুম পারো, যেহেতু কিছুক্ষন পরই তুমি আমাদের কৌতুহল মেটাবে সেহেতু তোমার কৌতুহল মেটানো আমাদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। এটা একটা গাইড এজেন্সী। গাইড ভাড়া দেয়া হয় এখানে।'

সাইফ ঘুণাক্ষরেও কথাটা বিশ্বাস করল না। ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলে উঠল,'আজকাল গাইডের এতই অভাব যে, গুন্ডাপান্ডা দিয়ে কাজ চালাতে হচ্ছে!'

হাসি মুছে গেল লোকটার চেহারা থেকে।

এমন সময় আচমকা সাইফ চিনে ফেলল সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে।

ছয়

আজ থেকে প্রায় বারো বছর ধরে বাংলাদেশ আর্মির ইন্টেলিজেন্স উইং এর টপ সিক্রেট ফাইলে একটা ছবি সযত্নে রাখা আছে।

প্রায় বারো বছর আগে শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (তৎকালীন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) থেকে এক বিদেশীকে বাংলাদেশ ত্যাগ করার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। তার গন্তব্য ছিল আমেরিকা। অনেকটা দৈবভাবেই তার ব্রিফকেসে গোপন একটা কম্পার্টমেন্টের সন্ধান পায় কাস্টমস অফিসাররা। সেখানে খুঁজে পাওয়া গেল একটা ফাইল। খতিয়ে দেখা গেল, তার মাত্র কিছুদিন পরই বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সম্পুর্ন ডিটেইলস রয়েছে সেই ফাইলে। ওই সম্মেলনে কয়েকটি উন্নত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরাও যোগ দেবেন।

ব্যাপারটা আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে কাস্টমস অফিসাররা এনএসআইকে খবর দেয়। তারা সেই বিদেশীকে নিজেদের জিম্মায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেও গুরুত্বপূর্ন কিছু জানতে ব্যার্থ হয়। শেষপর্যন্ত কেসটা ইন্টেলিজেন্স উইং এর হাতে চলে যায়। সেখানে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ইন্টারোগেশন করে জানা যায়, এই বিদেশীর নাম ইউরি কোলম্যান। তাকে পাঠানো হয়েছে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনের ডিটেইলস জানার জন্য।

এতটুকু জানা যেতেই কূটনৈতিক পর্যায়ে চাপ আসতে শুরু করল ইউরি কোলম্যানকে ছেঁড়ে দেবার জন্য। একটি স্যুপার পাওয়ার সরাসরি হস্তক্ষেপ করে ইউরির মুক্তির ব্যাপারে। ছেড়ে দিতে হয় ইউরিকে। তবে ছেড়ে দেবার আগে শেষবারের মত ইন্টারোগেশন করে ইন্টেলিজেন্স উইং। জানতে পারে, ইউরি

মূলত কার হয়ে কাজ করছিল।

এই মুহূর্তে সাইফের সামনে যে বসে আছে, সে আর কেউ নয়, ইউরি কোলম্যান!

সাইফ ইন্টেলিজেন্স উইং এর ফাইলে ইউরির ছবি দেখেছে, সেই সাথে পরিচয়টাও। এদের সত্যিকারের পরিচয় জানতে পেরে ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল সাইফ। ভয়ংকর অসহায় ঠেকল নিজেকে। ও একা একা কী করতে পারবে এই মহা শক্তিধর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে? তবে আপাতত একটা কাজই করার আছে, ও যে ভড়কে গিয়েছে সেটা এদের কিছুতেই বুঝতে দেয়া যাবে না।

‘বাংলাদেশে ধরা খাবার পর থেকে তোমার কর্তারা এখানে, এই গুন্ডাপান্ডাদের মাঝে নির্বাসন দিয়েছে বুঝি, ইউরি কোলম্যান?’ বাঁকা হাসি নিয়ে বলল সাইফ।

ভয়ানকভাবে চমকে উঠল ইউরি। হাসিটা আগেই মুছে গিয়েছিল, এবার সেখানে ক্ষনিকের জন্য যেন ভীতি ছাপ ফেলে গেল। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলল, ‘কিভাবে চিনতে পারলে?’

‘আমার ব্যাপারে খোঁজ খবর করেছো আর এটা জানো না, আমি ইন্টেলিজেন্স উইং এ ছিলাম? ওই যে যারা তোমাকে পেঁদিয়ে কথা বার করেছিল!’ এবারও হাস্যজ্জল সাইফের চেহারা।

তামাটে মুখটা রাগে লাল হয়ে গেল ইউরির। রুমে উপস্থিত বাকি সবাই বোকার মত ওদের কথা শুনছে। সেদিকে লক্ষ্য করেই হয়ত এবারও নিজেকে সামলে নিল ইউরি।

‘যাক, চিনতেই যখন পেরেছো, ভালই হল। আর লুকোছাপার দরকার নেই। এবার তাহলে বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই, কতবড় গাড্ডায় পড়েছো তুমি?’

‘গাড্ডায় আমি পড়েছি নাকি তুমি, ইউরি? তুমি এখানে কী করছ? নিশ্চয়ই

শাস্তি হিসেবে পাঠানো হয়েছে? সম্ভবত এই ট্রেজার হান্টের আইডিয়াটা হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারে কাজে লাগাতে চাইছো, তাই না?' সাইফ যথা সম্ভব ক্ষেপিয়ে দিতে চাইছে ইউরিকে। তাতে করে একটা সুযোগ পেলেও পেতে পারে।

ফাঁদে পা দিল না ইউরি। ঠান্ডা গলায় বলল, 'তোমাকে যা ভেবেছিলাম, তুমি তাঁর চাইতেও স্মার্ট। ওভার স্মার্ট। কি জানো, ওভার স্মার্টদের পরিণতি ভাল হয় না কখনো?'

'হুম, জানি, তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি!'

হেসে উঠল ইউরি। নাহ, তুমি তো বড্ড বেয়ারা হে! যাকগে, ট্রেজারের সন্ধান বলে দাও। ছেড়ে দেই তোমাদের। ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই, তাই না?'

সুকুমার রায়ের ছড়াটা মনে পড়ে গেল সাইফের। এক দানব গোবেচারা টাইপের এক লোককে ধাওয়া করতে করতে ছড়া কাটছে, "ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারবো না!"

এখনকার পরিস্থিতি অনেকটা তেমনই বলা চলে। ট্রেজার যদি সাইফ নিজের ঘাড়ে করে বয়ে এনে এদের সামনে রাখে, তবুও এরা ওকে বাঁচতে দেবে না। প্রশ্নই ওঠে না।

'আচ্ছা, ট্রেজারের খবর তোমরা পেলে কি করে?' প্রশ্নটা অনেকক্ষন যাবতই খোঁচাচ্ছিল সাইফকে।

'নাসেরের ব্যাপারে একটা রিউমার বেশ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল যে সে মরুভূমিতে গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে। তার উপরে অনেকেই নজর রেখেছিল। সেই নাসেরের মৃত্যুর এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই যদি এক বিদেশী এসে তার একমাত্র উত্তরাধিকারীর সাথে মরুভূমিতে ঘোরাঘুরি করতে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে অসুবিধা হবার কথা না। তুমি এয়ারপোর্ট

থেকে নেমে নাসেরের বাড়িতে যাবার সাথে সাথেই লোকাল গ্যাং-এর চোখে পড়ে গিয়েছিলে। তারাই তথ্যটা আমাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এরপর যখনই জানলাম তুমি গাইডের খোঁজ করছ, আমার কাজ সহজ হয়ে যায়। আমিই মোবারককে পাঠাই তোমার কাছে। আমার লোক তোমার উপর চব্বিশ ঘন্টা নজর রেখেছিল। সেটা অবশ্য তোমার জানার কথা না। হোটেলে আমাদের নিজস্ব লোক আছে। আজ যখন জানলাম মোবারক তোমাকে নামিয়ে দেবার পরই তুমি আবার বেরিয়ে পড়েছো, সাথে সাথে মোবারককে তোমার পিছু নিতে বলি। তুমি ওই পিরামিড থেকে বেরিয়ে আসার পরই ও ঢোকে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, কিছুই পায়নি ও। কোথায় লুকিয়ে রেখেছো ট্রেজার?'

'তোমার মাথামোটা গাইড কি বলেছে, আমি কতক্ষন ছিলাম পিরামিডের ভেতরে?'

'হুম, একঘন্টার কিছু বেশি।'

'তো, তুমি কিভাবে ভাবলে এক ঘন্টার মধ্যে আমি একা একা ট্রেজার লুকিয়ে ফেলব?'

'তুমি নিজে না লুকালেও ওটা নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে। আর তুমি জানো, কোথায় খুঁজতে হবে।'

'আমার ব্যাপারে তোমার ভাল ধারণা দেখে আমি গর্বিত! কিন্তু এরকম ধারণা তোমার কি করে হল?'

'মোবারক আমাকে বলেছে, ওই পিরামিডে দির্ঘদিন যাবত মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। অর্থাৎ ট্রেজার চুরি হয়নি। তারমানে ওখানেই কোথাও লুকনো আছে।'

'মোবারককে এতটা বিশ্বাস করছো কেন? ব্যাটা তো তোমাকে ব্লাফও দিতে পারে। একাই সব ট্রেজার মেরে দেয়ার ধান্দা!'

প্রতিরোধ করার সময় পেল না সাইফ। তার আগেই ছুটে এসে ওর চোয়ালে ঘুষি বসিয়ে দিল ইউরি। সাথে সাথেই ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াতে শুরু করল।

‘তোমার বোলচাল অনেক সহ্য করেছি, সাইফ। আজকের রাতটা সময় দেয়া হল। কাল সকালের মধ্যে যদি আমাদের ট্রেজারের সন্ধান না দাও তাহলে যেকোনো পরিণতির জন্য আমি দায়ী থাকব না। তোমাকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল, তুমি নাওনি।’ চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বলেই ইশারা করল সাইফকে নিয়ে যেতে।

ইউরির কথা শেষ হতেই ওকে আবারও পিস্তলের মুখে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাওয়া হল। এবার মোবারক একাই এসেছে ওর সাথে। একটা করিডোর ধরে যাচ্ছে ওরা।

মুখ খুলল মোবারক, ‘বসের সাথে হাংকি পাংকি করে বেঘোরে মারা পড়ার কী দরকার, মিস্টার সাইফ। তার কাছে আপনি নিতান্তই শিশু।’

‘তুমি ইউরির আসল পরিচয় জানো?’

‘হুম, শুধু আমি একাই জানি।’

‘শুনে খুশি হলাম। যাকগে, তোমার বসকে বলে দিও, আমার গায়ে অন্যায়ভাবে কেউ হাত তুললে আমি সেটা ভুলি না।’

হো হো করে হেসে উঠল মোবারক। ‘আমার বলার দরকার পড়বে না। আপনি কাল সকালে নিজেই বলতে পারবেন।’

‘ওর সাথে কাল সকালে সম্ভবত আমি দেখা করতে পারব না। আমার জরুরী কিছু কাজ আছে!’

আবারও গলা ছেড়ে হেসে উঠল মোবারক। সাইফও হাসল। তবে ওর হাসিটা দেখলে মোবারকের হাসি বন্ধ হয়ে যেত।

করিডোরের শেষমাথায় পৌঁছে কার্পেট সরাতেই একটা ট্র্যাপডোর দেখা গেল। খুলতেই নীচে একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে। ওখান দিয়ে নেমে পড়ল ওরা দু' জন। এখানেও এক চিলতে করিডোর দেখা যাচ্ছে। ওমাথায় ছোট একটা রুমের দরজা। লোহার শিক দিয়ে বানানো। এটা আগে সেলার ছিল। এখন বন্দিশিবির বানানো হয়েছে।

চমৎকার! ভাবল সাইফ।

মোবারক তালা খুলে ধাক্কা দিয়ে সাইফকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

ঘরে লোহার একটা কট শুধু। ওখানে বসে ছিল সুমাইয়া। সাইফকে ভেতরে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল। চেহারায় একরাশ বিস্ময় নিয়ে বলল, 'আপনাকেও ধরে এনেছে ওরা?'

'সেদিন আপনাদের বাড়ি থেকে চলে আসার পর তো আর দেখাই হল না। তাই দেখা করতে চলে এলাম!' হাসিমুখে জবাব দিল সাইফ।

সাইফের রসিকতা স্পর্শ করল না সুমাইয়াকে। মাত্র কয়েক ঘন্টার দুশ্চিন্তাই মেয়েটার মুখ থেকে লাবন্য যেন শুষে নিয়েছে। এতটুকু হয়ে গেছে মুখটা।

'আপনার বাবার কী অবস্থা?' সিরিয়াস হল সাইফ।

মুখের কালো ছায়াটা আরো গাঢ় হল সুমাইয়ার। 'আমাকে ধরে আনার সময় বাবা বাধা দিতে গিয়েছিল, তখন একজন পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বাবা। এরপর কী হয়েছে জানি না।'

'কিছুই হবে না, ইনশাআল্লাহ।'

'এরা কী চায়?'

'ট্রেজার।'

'কারা এরা, জানেন আপনি?'

মাথা ঝাঁকাল সাইফ।

‘কারা এরা?’

‘সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টস।’

‘মানে?’ বোকার মত তাকিয়ে আছে স্মুমাইয়া।’

‘মানে,’ মুচকি হাসল সাইফ, ‘মোসাদ!’

‘মোসাদ!’ আতকে উঠল স্মুমাইয়া।

‘হুম, ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা, যাদেরকে এসপিওনাজ জগতে ‘লাইসেন্সধারী খুনী’ বলা হয়। তবে আমার ধারণা মোসাদ এই ব্যাপারে সরাসরি সম্পৃক্ত না। এখানকারইনচার্জ ইউরি কোলম্যান মোসাদের একজন ফিল্ড এজেন্ট ছিল আগে। বারো বছর আগে বাংলাদেশেএকটা মিশনে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। পরে কুটনৈতিক চাপে মুক্তি পেলেও সম্ভবত ওকে ডেস্ক-জবদিয়ে মিশরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইউরি এখন চাইছে এই ট্রেজার উদ্ধার করে সেই হারানোসম্মান পুনরুদ্ধার করতে। ফিল্ডে কাজ করার সময় পেরিয়ে এসেছে লোকটা, তবে ট্রেজারমোসাদের হাতে তুলে দিতে পারলে মোসাদের অনেক বড় পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে সে। এজন্যই একেবারে মরিয়া হয়ে গেছে।

অবশ্য মোসাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা না থাকলেও তাতে আমাদের বিশেষ কোনো লাভ হচ্ছে না। মোসাদের নেটওয়ার্ক সে ঠিকই ব্যাবহার করতে পারবে। যেহেতু সে-ইমিশর ব্রাঞ্চের ইনচার্জ, সেহেতু কাউকে জবাবদিহিও করতে হবে না তার। ইউরি তার শক্তির পুরোটাই ব্যাবহার করবে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ ঘোলাটে।’

‘হুম, কিন্তু এই লোকটা মোসাদের জন্য ট্রেজার উদ্ধার করতে চাইছে-সেটা ভাবছেন কেন? নিজের জন্যও তো করতে পারে।’

‘মোসাদ সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই দেখেই বলতে পারছেন এটা। আপনার ধারণা ইউরি ট্রেজার উদ্ধার করতে পারলেও এই টাকা ভোগ করতে পারবে? সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ সময় লাগবে মোসাদের ব্যাপারটা টের পেতে, এরপর...’ ইচ্ছে করেই বাক্যটা অসমাপ্ত রাখল সাইফ।

চিন্তায় ডুবে গেল স্যমাইয়া। ওকে খানিক সাহস দেবার জন্য সাইফ আবারও বলল, ‘আমাদের জন্য আরেকটা প্লাস পয়েন্ট অবশ্য আছে। ইউরি এখানে একজন গাইড এজেন্সি ব্যবসায়ীর কাভার নিয়ে আছে। যারা এখানে কাজ করছে তারা সবাই স্থানীয় লোক। শুধুমোবারক ছাড়া আর কেউই ইউরির আসল পরিচয় জানে না। স্যতরাং আপাতত আমাদের মোকাবেলা কোনো হাইলি ট্রেইন্ড সিক্রেট এজেন্টের সাথে করতে হচ্ছে না। যদিও ইউরিকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই।’

‘হুম,’ চুপ মেরে গেল স্যমাইয়া। একটু পর জরুরি কিছু মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, ‘ওহ আসল কথাই তো জিজ্ঞেস করা হল না, ট্রেজার পেয়েছেন?’

‘নাহ।’

‘না মানে? ট্রেজার কোথায় যাবে?’

‘যায়নি কোথাও। আপনার চাচা কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন, সেই সাথে অদ্ভুত কিসিমের একটা ধাঁধাও রেখে গেছেন।’

‘ঠিক বুঝলাম না।’ ভ্রু কোঁচকাল স্যমাইয়া।

সব খুলে বলল সাইফ। ধাঁধাটাও বলল। ধাঁধা লেখা কাগজটা অবশ্য হোটেল রুমে আছে।

‘এটা আবার কি রকম ধাঁধা?’ ধাঁধা শুনে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভ্রু জোড়া কপালে উঠে গেল মেয়েটার।

‘সেটা আপনার মরহুম চাচাই ভাল বলতে পারবেন।’

‘নাসের চাচা থ্রিলারের পোকা ছিলেন। এমনকি আপনাদের বাংলাভাষার গোয়েন্দা সিরিজ ‘ফেলুদা’ ও তাঁর ব্যাক্তিগত পাঠাগার দখল করেছিল। ইংরেজি অনুবাদ।’

‘যাক, তাও ভাল, ফেলুদা টাইপ ধাঁধা লিখে যাননি। “মুড়ো হল বুড়োগাছ”! অবশ্য যেটা রেখে গেছেন সেটাও কম প্যাঁচালো মনে হচ্ছে না। তবে একটা ধন্যবাদ তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। তিনি যদি এই জটিলতা তৈরি না করে যেতেন তাহলে ট্রেজার এতক্ষনে মোসাদের হাতে চলে যেত।’

বেশ কিছুক্ষন নীরবে কেটে গেল।

‘আচ্ছা আগামীকাল ওরা কী করবে আমাদের সাথে?’ স্যুমাইয়ার গলায় উৎকন্ঠা ঢেলে জানতে চাইল।

‘কী আর করবে, টর্চার করবে। আমার উপর টর্চার করে যখন স্যুবিধে করতে পারবে না তখন আপনার উপর টর্চার শুরু করবে।’ খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল সাইফ।

স্যুমাইয়ার মুখ কালো হয়ে গেল দেখে হেসে ফেলল সাইফ।

‘চিন্তা করবেন না। কাল পর্যন্ত এখানে বসে বসে মাছি মারার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই।’

‘তাহলে কী করবেন?’

‘এখান থেকে পালাতে হবে।’

‘অসম্ভব!’

‘কোথায় যেন শুনেছিলাম, পৃথিবীতে এমন কোনো ঘর নেই যেখান থেকে পালানো সম্ভব না, কিন্তু আপনার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে কেন?’

‘সেটা হতে পারে, তবে এই ঘর থেকে পালালেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না।’

ভ্রু কোঁচকাল সাইফ। ‘কেন?’

স্থমাইয়া হাত দিয়ে একদিকে ইশারা করল।

এই ঘরটা সেলার হিসেবে তৈরী করা হলেও একেবারে পুরোটা মাটির নীচে নয়। রুমে আলো বাতাস আসার জন্য ছাদের নীচ থেকে চার ফুটের মত মাটির উপরে তৈরি করা হয়েছে। এই বর্ধিত অংশে একটা স্কাইলাইট রয়েছে। দুই বাই দুই ফুট। একজন স্বাভাবিক মানুষ অনায়াসে গলে বের হয়ে যেতে পারবে। তবে সমস্যাটা হল, ওটা আর এখন স্কাইলাইট নেই। লোহার শিক বসানো হয়েছে গোটা কয়েক। স্কাইলাইটটা বাড়ির পেছনের দিকে মুখ করা। স্থমাইয়া সাবেক ওই স্কাইলাইটের দিকেই ইশারা করেছে।

‘কী ওখানে?’ বুঝতে পারল না সাইফ।

‘নিজেই গিয়ে দেখুন।’

লোহার কটের উপর দাঁড়িয়ে স্কাইলাইট দিয়ে বাইরে তাকাল সাইফ। কয়েক মুহূর্ত কিছুই নজরে এল না। ঘুটঘুটে আঁধারে শুধু নীলাভ আকাশ দেখা যাচ্ছে। একটু পর হঠাৎ করেই আকাশ ঢাকা পড়ে গেল। এরপর আবারও।

সাইফ এতক্ষনে ধরতে পারল ব্যাপারটা। ওদের এই সেলারে বন্দি করেই ক্ষান্ত হয়নি ইউরি। পেছনের এই অংশটা তুলনামূলক কম সুরক্ষিত হওয়ায় পাহারাও বসিয়েছে। দুজন গার্ড টহল দিচ্ছে। টহল দিতে দিতে এই স্কাইলাইটের কাছে এলেই আকাশের পটভূমিতে তাদের দেহাবয়ব চোখে পড়ছে।

‘ব্যাটা কোনো ঝুঁকি নিচ্ছে না!’ কট থেকে নেমে বলল সাইফ।

‘সেজন্যই বললাম যে এই ঘর থেকে বেরোতে পারলেও ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা পালাতে পারব না। আর বাড়ির সামনের অংশ দিয়ে পালানো তো

একেবারেই অসম্ভব।’

‘হুম, বাড়ির সামনের অংশ দিয়ে পালানো অসম্ভব। এত লোককে ফাঁকি দেয়া যাবে না।’ সায় জানাল সাইফও।

‘তাহলে এখন?’

‘উমম...ভাবতে হবে।’ বলেই সাইফ স্কাইলাইট দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। ওর ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে, স্কাইলাইট দিয়ে বুঝি উদাসী ভঙ্গিতে আকাশ দেখছে!

বেশ কিছুক্ষন কেটে যাবার পর যেন মুনিঋষির ধ্যান ভাঙ্গল।

‘প্ল্যান রেডি!’ আচমকা বলে উঠল সাইফ।

‘কিসের প্ল্যান?’

‘কিসের আবার, পালানোর।’

‘আপনি এখনো পালাবার ব্যাপারে আশাবাদী?’

‘নিরাশ হবার মত কিছু কি ঘটেছে? যাকগে, যা বলি মন দিয়ে শুনুন। আমি যে প্ল্যানটা করেছি তার জন্য চুলচেরা সময়ের হিসাব, ভাগ্য এবং সেই সাথে আপনারও খানিক সহায়তা প্রয়োজন।’

‘আমি কী সহায়তা করব?’

‘সময় হলেই জানতে পারবেন। আপাতত চাইলে শুয়ে বিশ্রাম নিতে পারেন।’

‘আর আপনি?’

‘আমাকে এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে।’

‘কী কাজ?’

‘লোহার শিকগুলোর একটা গতি করতে হবে।’

‘হাত দিয়ে?’ ব্যঙ্গ করল সুমাইয়া।

সুমাইয়ার ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিটাকে পাত্তা দিল না সাইফ। ‘হাতদিয়ে তো অবশ্যই। আমি আবার পা দিয়ে তেমন কাজ করতে পারি না!’

সুমাইয়া হয়ত আরো কিছু বলতে চাইছিল, সাইফ সুযোগ দিল না। পকেট থেকে বের করে আনল একটা চাবির রিং। সাইজে কড়ে আঙ্গুলের চাইতেও ছোট হবে।

‘কী এটা?’

‘মিনি অক্সিটিলিন গান।’ বলে চাবির রিঙের একপ্রান্ত ধরে মোচড় দিতেই হিস হিস করে আগুনের লেলিহান শিখা বেরোতে লাগল। লোহার কটের একটা পায়ায় শিখাটা ধরতেই যেন মাখনের মত কেটে যেতে লাগল।

পায়াটা পুরোপুরি কাটল না সাইফ। কিছু অংশ রেখে দিল, যেন টানপড়লেই খুলে আসে।

‘ও মাই গড!’

হাসল সাইফ।

‘কোথায় পেলেন এটা?’

‘এ ধরনের ছোটখাট জিনিস সাথে রাখতে হয়, ম্যাডাম।’

‘কিন্তু শিক কাটতে গেলে তো গার্ডদের চোখে ধরা পড়ে যাবে।’

‘উহু, পড়বে না। এখানেই সময়ের চুলচেরা হিসেবের প্রশ্ন চলে আসে।’

সুমাইয়া হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল সাইফের দিকে।

আবারও মুচকি হাসল সাইফ। ‘বুঝলেন না তো? দাঁড়ান, বুঝিয়ে বলছি।’

সাইফ বলতে লাগল, ‘স্কাইলাইটের ওপাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে

তারপরই বাড়ির পেছনের বাউন্ডারি ওয়াল। এই ফাঁকা জায়গাটাতে টহল দিচ্ছে দুজন গার্ড। ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন, প্রতি বিশ সেকেন্ড পর পর তারা পরস্পরকে ক্রসকরছে ঠিক এই স্কাইলাইটের সামনে এসে।' থামল সাইফ।

'হুম, তাতে কী প্রমান হয়?'

'তাতে প্রমাণ হয় এই স্কাইলাইটটা বাড়ির ঠিক মাঝ বরাবর।'

সুমাইয়ার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে কিছু বোঝেনি। সাইফ বলে যেতে লাগল, 'তারমানে ওরা পরস্পরকে এই স্কাইলাইটের সামনে এসে ক্রস করবার পর বাড়ির শেষ মাথায় গিয়ে আবার ঘুরে ফিরে আসতে থাকে। এই দশ সেকেন্ড তারা দুজনেই স্কাইলাইটের দিকে পেছন ফিরে থাকে। আমাদের এই দশ সেকেন্ড সময়ই প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যেই ধীরে ধীরে শিকগুলো কাটতে হবে।

'হুম, গুড আইডিয়া। তবে আরেকটা সমস্যাও তো আছে। শিক না হয় ওদের অগোচরে কাটা গেল কিন্তু ওদের অগোচরে তো বের হওয়া সম্ভব না।'

সাইফ হেসে ফেলল। 'আপনি তো দেখছি একের পর এক সমস্যা বের করে যাচ্ছেন। চিন্তার কিছু নেই, ওটাও ভেবে রেখেছি। আপনাকে সামান্য হেল্প করতে হবে। আপাতত আপনি একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারেন। কাল আবার ঝক্কি পোহাতে হতে পারে। রাত অবশ্য খুব বেশি বাকিও নেই।'

সুমাইয়া কিছু না বলে খাটে গিয়ে বসে পড়ল।

সাইফ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে নজর দিল স্কাইলাইটের দিকে। ফাঁকা ওপাশটা। ঘন আঁধার। খানিক বাদেই আকাশটা মুহূর্তের জন্য ঢেকে যেতেই সাইফ বুঝতে পারল, গার্ড দুজন এইমাত্র পরস্পরকে ক্রস করল। পরবর্তী দশ সেকেন্ড তারা স্কাইলাইট থেকে পেছন ফিরে থাকবে।

দু সেকেন্ড পর কাজ শুরু করল সাইফ। মিনি অক্সিটিলিন গানটাচালু করে একটা শিকের এক প্রান্তে ধরল। খুবই মৃদু হিস হিস শব্দের সাথে কেটে যেতে লাগল লোহা। ছয় সেকেন্ড সময় নিল শিকটা কাটতে। কাটা হতেই সাথে সাথে স্কাইলাইটের কাছ থেকে সরে এল সাইফ। লোহাটা এখন উত্তাপে কমলা বর্ণ ধারণ করে আছে। মনে মনে প্রার্থনা করল, ব্যাপারটা যেন গার্ডদের কারো চোখে ধরা না পড়ে। ধরা পড়ল না। খানিক বাদে আবারও আকাশ ঢেকে যেতেই কাজে নেমে পড়ল সাইফ। আগের শিকটার অপরপ্রান্ত এবার কাটতে লাগল। এবারও নির্বিঘ্নেই কাটতে সক্ষম হল। পুরোপুরি কাটেনি। কটের পায়ার মতই সামান্য একটু অংশ রেখে দিয়েছে, যেন হাঁচকা টানে খুলে আসে। মোট তিনটা শিক এভাবে কাটতে পারলেই বের হবার জায়গা বেরিয়ে যাবে। এর বেশি কাটা যাবে বলেও মনে হয় না। এই অক্সিটিলিন গানটার ক্ষমতাখুবই কম।

পরবর্তী দশ মিনিট অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গার্ডদের নজর বাঁচিয়ে শিকগুলো কেটে ফেলল সাইফ। একই সাথে সময়য়ের চুলচেরা হিসেবও রাখতে হচ্ছে। এক সেকেন্ড এদিক ওদিক হলেই আগুনের শিখা চোখে পড়ে যাবে গার্ডদের।

কাজ শেষ হপ্তেই স্কাইলাইটের কাছ থেকে সরে এল। আপাতত আর কোনোকাজ নেই। এবার সকালের অপেক্ষা। কাজের মাঝখানে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখেছে স্তমাইয়া দেয়ালের দিকে মুখ করে কটে শুয়ে আছে। জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে না। এমন মানসিক অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ার কথা না। তবে আসলেই ঘুমিয়ে পড়লে ব্যাপারটা সাইফের জন্য ইতিবাচক। তাহলে ধরে নেয়া যায় মেয়েটা ওর উপর ভরসা করতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে মনের জোরের বিকল্প নেই।

* * *

লোহার গেট খোলার আওয়াজে ঘুম টুটে গেল সাইফের। কাজ সেরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়েছিল, তাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশিক্ষন হয়নি, বড়জোর একঘন্টা। স্থমাইয়াও শব্দ পেয়ে উঠে বসেছে। ছোট্ট সেলটায় করিম এবং আরেকজন লোক প্রবেশ করল এইমাত্র। অপরজনকে আগে দেখেনি সাইফ। কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ল। বাড়িটাতে মোট কতজন লোক আছে জানা থাকলে কাজে দিত। আরও আশংকার কথা আজ আর হ্যাঁন্ডগান না, রীতিমত উজি নিয়ে এসেছে করিম! ইজরাইলের তৈরি সাবমেশিনগান। আকারে ছোট, সহজে বহনযোগ্য এই ভয়াবফ মারনাস্ত্র বেশ জনপ্রিয়। কলাপসড অবস্থায় মাত্র সতেরো ইঞ্চি।

'জলদি বের হও,' করিম হাতের অস্ত্র নেড়ে ইশারা করল ওদের, 'বস অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য।

সাইফ জবাব দেবার আগে পলকের জন্য স্থমাইয়ার দিকে তাকাল। চোখেচোখে কথা হয়ে গেল দুজনের। প্রতিপক্ষের মনোযোগ সরাতে সাইফ বলল, 'তোমার বসকে গিয়ে বলো, ট্রেজারের সন্ধান আমি জানি না।'

'ওসব ধানাই পানাই চলবে না,' ক্ষেপে গেল করিম, 'যা বলার বসকে গিয়ে বলবে।'

স্থমাইয়া খাট থেকে নামার সময় পায়াটা প্রতিপক্ষের অগোচরে খুলে নিয়ে জামার হাতায় ভরে ফেলেছে। চোখের কোন দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ্য করল সাইফ। আর দেরী করার মানে হয় না। এবার আসল কাজে নামার সময় এসে গেছে।

'ঠিক আছে, চলো তাহলে, ইউরিকেই বলব সব,' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি দেখা গেল সাইফের মধ্যে।

সাইফ আগে স্থমাইয়াকে যাবার স্থযোগ করে দিল। সবার আগে স্থমাইয়া, এরপর দ্বিতীয় লোকটা, তিন নাম্বারে সাইফ, সবশেষে করিম লাইন ধরে উপরে

ওঠার সিড়ির দিকে এগোলো।

সাইফের প্রতিটি পেশী ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে আছে। আর ফুট বিশেক সামনেই উপরে ওঠার সিঁড়ি। যা করবার এর মধ্যেই করতে হবে। আড়চোখে একবার দেখে নিল, করিম ওর ঠিক দুই ফুট পেছনেই আছে। উজিটা ওর মাথা বরাবর তাক করা। সাইফ বুঝতে পারছে করিম একেবারেই অ্যামেচার। হয়ত স্থানীয় গুন্ডাপান্ডা হবে। নয়ত ওর গায়ে গায়ে লেগে থাকতনা। কমপক্ষে চার ফুট পেছনে থাকত।

আর যখন পনেরো ফুট দূরে সিঁড়িটা ঠিক তখনই বিদ্যুৎ খেলে গেল সাইফের দেহে। ঝট করে জায়গায় বসে পড়ল। সাইফের আচমকা বসে পড়াতে ওর ঠিক দুই ফুট পেছনে থাকা করিম ভারসাম্য হারাল। সাইফের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। তবে ভারসাম্য হারিয়েছে ক্ষণিকের জন্য। এই সময়টাই প্রয়োজন ছিল সাইফের। আগের চাইতেও দ্রুতগতিতে আবার উঠে দাঁড়াল সাইফ। পুরোপুরি ওঠার আগেই একটা আপারকাট ঝাড়ল করিমের থুতনি লক্ষ্য করে। সেই সাথে হাঁটুর ঠিক উপরে কড়া করে এক লাথি।

আপারকাটটা বড় শক্ত মার ছিল! সামলাতে পারল না করিম। "হুক"জাতীয় একটা শব্দ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

এদিকে পেছনে গন্ডগোল টের পেয়ে অপর লোকটা ফিরে তাকিয়েছিল। ততক্ষণে করিম মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। সাইফ দ্বিতীয় লোকটার দিকে মনোযোগ দিতে চাইল, কিন্তু তার দরকার পড়ল না। স্মুমাইয়ার দিকে পেছন ফিরতেই আস্তিন থেকে লোহার পায়াটা বের করে ধাঁই করে লোকটার মাথায় মেরে বসল মেয়েটা। চোখ উল্টে কাটা কলা গাছের মত সটান আছড়ে পড়ল এই লোকটাও। পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল মাত্র ছয় সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে।

'নাইস ওয়ার্ক!' হেসে বলল সাইফ। ইশারায় বাকি কাজ সারতে বলল।

স্থমাইয়াও হেসে ফেলল। মাথা ঝাঁকিয়ে আবার সেলের দিকে রওনা হয়েগেল। যাবার আগে সংজ্ঞাহীন করিমের মাথায় সপাটে হাতের রডটা আবার চালাল। এটা প্ল্যানে ছিল না। বাপকে মারার প্রতিশোধ নিল আরকি!

মুখ ঘুরিয়ে আবারও হেসে ফেলল সাইফ। হাত বাড়িয়ে করিমের পাশ থেকে উজিটা তুলে নিল। ট্রেনিং-এ অস্ত্রটা আগেও চালিয়েছে সাইফ। ওজন অনুভব করে বুঝতে পারল ফুললি লোডেড।

পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে চলে এল করিডোরে। এখান থেকে ইউরির অফিস রুম দেখা যাচ্ছে। ওটাই সম্ভবত মিশরে মোসাদের নার্ভ সেন্টার। এই রুম থেকেই নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে ইউরি।

উজিতে সাধারণত ২৫ রাউন্ড বুলেট থাকে, তবে ৪০ থেকে ৫০ রাউন্ড পর্যন্ত এক্সপেন্ডবল করা যায়। এটার ম্যাগাজিন এক্সপেন্ডবল করা হয়েছে।

উজিটা তুলে সেফটি ক্যাচ অফ করল সাইফ। এক পশলা গুলী ছুড়ে দিল ইউরির অফিসের বন্ধ দরজা লক্ষ্য করে। প্রথম দফাতেই প্রায় অর্ধেক ম্যাগাজিন খালি করে ফেলল। ভারীওক কাঠের দরজার সারফেস ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল নিষ্ঠুর বুলেটের আঘাতে। তবে ওপাশের কারো ক্ষতি করতে পারেনি বোধহয়। দরজা একেবারে ফুটো হয়নি। তার প্রয়োজনও নেই। সাইফ স্রেফ আতংক সৃষ্টি করতে চাইছে। সাইফের উদ্দেশ্য সফল। গুলীবর্ষণ থামতেই, দরজার ওপাশ থেকে হল্লার আওয়াজ ভেসে এল। সাইফ অপেক্ষা করছে। এমন সময় নীচের সেল থেকে স্থমাইয়ার চিৎকার ভেসে এল। এটার অপেক্ষাতেই ছিল সাইফ। তবে চিৎকার শুনেই নড়ল না জায়গা ছেড়ে। গুলীবর্ষণে ছেদ পড়েছে দেখে কেউ একজন ইউরির রুমের দরজা খুলতে গেল পরিস্থিতি আঁচ করবার জন্য। সাথে সাথেই দ্বিতীয় দফা বুলেট ওগড়ালো সাইফের উজি। ঝট করে ফের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আর সামান্য কিছু বুলেট অবশিষ্ট আছে হাতের অস্ত্রটায়। এটা কাজে লাগতে

পারে। উজিটা নিয়েই সিঁড়ি বেয়ে আবার নীচে চলে এল সাইফ।

সুমাইয়া উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে সেলে। ওকে দেখেই জানাল, গার্ড দুজন টহল বাদ দিয়ে বাড়ির সামনের অংশে চলে গেছে।

এখন পর্যন্ত সব কিছু সাইফের প্ল্যান মাফিকই ঘটছে। ওদের পালানোর পথে সবচাইতে বড় বাধাটা ছিল পেছনের এই দুই গার্ড। তাদের এখান থেকে সরাবার জন্য প্রয়োজন ছিল একটা ডাইভার্শন ক্রিয়েট করা। সেটাই করেছে সাইফ। বাড়ির সামনের অংশে গোলাগুলীর আওয়াজ শুনে গার্ড দুজন স্থান ত্যাগ করেছে। এরা প্রফেশনাল হলে অন্তত একজনকে রেখে যেত এখানে। এখানেই একজন ওয়েল ট্রেইন্ড কমান্ডোর সাথে সাধারণ গুন্ডাপান্ডাদের পার্থক্য।

সাইফ এগিয়ে গিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে গতরাতে কেটে রাখা তিনটা শিকই একে একে খুলে ফেলল। বিপদের আশংকায় আগে নিজেই মাথা গলালো সদ্য গজানো ফাঁকে। কেউ নেই এখানে। বেরিয়ে পড়ল সাইফ। এরপর সুমাইয়াকেও বের হতে সাহায্য করল। হাতের উজিটা একমুহূর্তের জন্যও হাতছাড়া করেনি।

বের হয়ে সাইফকে এদিক ওদিক তাকাতে দেখে সুমাইয়া ব্যাগ্রকন্ঠে বলে উঠল, 'জলদি চলুন, পালাতে হবে এখান থেকে।'

'উহু, এখনই না।'

'মানে?' গলা চড়ে গেল সুমাইয়ার।

'আস্তে!' মুখে হাত চাপা দিল সাইফ। 'শুনুন, এখন ওরা ওরা গরুখোঁজা খুঁজতে থাকবে আমাদের, সেজন্য এমন কোথাও লুকাতে হবে যেটা ওরা কল্পনাও করতে পারবে না।'

'কোথায় সেটা?'

বলল সাইফ। শুনে সুমাইয়ার চেহারা দর্শনীয় এক বস্তুতে পরিণত হল।

‘এই বাড়ির ছাদে!’ আবারও গলা চড়ে গেল স্মুমাইয়ার।

‘হুম,’ শান্ত ভঙ্গিতে বলল সাইফ।

‘আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!’ প্রশ্ন না মন্তব্য, ঠিক বোঝাগেল না! ‘ছাড়া পেয়েও শত্রুর নাকের ডগায় বসে থাকবেন?’

হাতে একদমই সময় নেই, তবু মাথা ঠান্ডা রেখে ব্যাখ্যা করল সাইফ, ‘দেখুন, এখন ওরা চারদিকে খোঁজ করতে লোক পাঠাবে। আমরা বেশিদূর যেতে পারব না, তার আগেই ধরা পড়ে যাব। কিন্তু এখানেই লুকিয়ে থাকলে আপনি যেমনটা ভাবছেন ওরাও হয়ত তেমনটাইভাববে। তবে আপনার কাছে এর চাইতে ভালো কোনো আইডিয়া থাকলে দিতে পারেন।’

স্মুমাইয়া চুপ করে থাকল, নেই আইডিয়া।

‘ওকে, তাহলে যা বলি সেটাই করুন।’

কথা শেষ করেই সাইফ বাউন্ডারি ওয়ালে উঠে পড়ল। টেনে তুলল স্মুমাইয়াকে। সেখান থেকে একটা কার্ণিশে উঠে আবারও টেনে তুলল মেয়েটাকে। কার্নিশ থেকে ছাদে ওঠা সহজ। ওরা ছাদে ওঠা মাত্রই মোবারকের নেতৃত্বে তিনজন লোক বাড়ির পেছনের ফাঁকা অংশটায় চলে এল। আর কয়েক সেকেন্ড দেরী হলেই চোখে পড়ে যেত ওরা। মোবারকসহ সবাই স্কাইলাইটের সামনে চলে এল। শিকগুলো কাটা দেখেই বুঝতে পারলো পাখি উড়াল দিয়েছে।

মোবারক চিৎকার করে নির্দেশ দিল, ‘জলদি গাড়ি বের করো, ওরা এখনো বেশিদূর যেতে পারেনি।’ নির্দেশ দিয়েই বাড়ির সামনের উঠোনে চলে এল সাঙ্গপাঙ্গ সহ।

সাইফও ছাদের সামনের অংশে চলে এল। সন্তর্পণে নীচে উকি দিতেই দেখতে পেল, ইউরি আরো দুজনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোবারক এসে জানাল,

পেছনে কী দেখে এসেছে। শুনেই রাগে ফেটে পড়ল ইউরি। এরই মধ্যে গ্যারেজ থেকে দুজন দুটো গাড়ি বের করে ফেলেছে। গাড়ি এসে দাঁড়াতেই একটাতে মোবারকসহ দুজন উঠল, অপরটাতে ইউরি বাকি দুজনকে নিয়ে উঠে পড়ল। দুজনকে সাইফ ধরাশায়ী করায় লোকবল কমে গেছে, সেজন্যই বোধহয় খোদ ইউরি বেরিয়ে পড়েছে। কিংবা হয়ত উৎকন্ঠা সামলাতে পারেনি।

গেট দিয়ে বেরিয়েই সাঁ করে দুটো গাড়ি দুদিকে চলে গেল। কারো মাথায়ই এল না, যাদের খোঁজে কায়রো চষে ফেলার উপক্রম করতে যাচ্ছে, তারা এই মুহুর্তে বন্দিশালার ছাদে বসে হাওয়া খাচ্ছে!

গেটে একজনকে শুধু পাহারায় রেখে যাওয়া হয়েছে। গার্ড অস্ত্রধারী। হোলস্টারে একটা হ্যাঁন্ডগান দেখা যাচ্ছে।

সুমাইয়াকে নিয়ে নীচে নেমে এল সাইফ। হাতে এখনও উজিটা ধরা। বাড়ির বাইরে বের হবার আগে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে উকি দিল সাইফ। গার্ড ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। হোলস্টারের অস্ত্রটাচিনতে পারল এবার সাইফ। ডেজার্ট ঈগল।

এক ঝটকায় দরজাটা খুলেই বেরিয়ে এল সাইফ। হাতে উজি প্রস্তুত। দরজা খোলার আওয়াজে হোলস্টারের দিকে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল গার্ড, সাইফের হাতের ভয়ংকর অস্ত্রটা দেখে হাতটা মাঝপথেই জমে গেল।

‘পিস্তলটা হোলস্টার থেকে বের করে এদিকে ছুড়ে দাও।’ গমগম করে উঠল সাইফের গলা।

গার্ড বুদ্ধিমান। সময় নষ্ট না করে ডেজার্ট ঈগল বের করে ছুড়ে দিল ওদের দিকে। কিছুটা দূরে গিয়ে পড়ল অস্ত্রটা।

‘সুমাইয়া, পিস্তলটা নিয়ে আসুন, আমি আপনাকে কাভার দিচ্ছি।’

সুমাইয়া কথা না বলে এগিয়ে গেল। অস্ত্রটা মাটি থেকে তুলে ফিরে আসতে

লাগল। সাইফ নিষ্কম্প হাতে কাভার করছে ওকে। নজর গার্ডের দিকে। মাঝে আড়চোখে স্যুমাইয়ার দিকে তাকাল একবার। ঠিক সেই সময়ই অসঙ্গতিটা নজরে পড়ল ওর।

তাকাতেই দেখতে পেল, স্যুমাইয়ার চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেছে। দৃষ্টি ওর পেছনে নিবদ্ধ। কিছু একটা বলতে চাইছে, কিন্তু প্রবল আতঙ্কে মুখে কথা সরছে না।

সাইফের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চিৎকার করে বলে উঠল-বিপদ!

এক মুহূর্তওদেরী করল না ও। চোখেরপলকে ডাইভ দিয়েছে। ডান কাধের উপরে ভর দিয়ে মাটি স্পর্শ করল ওর দেহ। একই সাথে পুরো শরীরটা ঘুরিয়ে ফেলেছে। ওর পেছনে উদ্যত ছুড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আছে করিম।

শরীর মাটি স্পর্শ করবার আগেই ট্রিগারে চাপ দিয়েছে সাইফ। প্রবল গতিতে ধেয়ে গেল তপ্ত বুলেট। ঝাঁঝরাহয়ে গেল করিমের দেহ। মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে।

সাইফের রিফ্লেক্স দেখে হাঁ হয়ে গেছে উপস্থিত দু'জনের মুখ। একজন মানুষের প্রতিক্রিয়া এত দ্রুতহয় কিভাবে!

উঠে দাঁড়াল সাইফ। বুঝতে পারছে, ওর উজির বুলেট শেষ। ব্যাপারটা গার্ড বুঝতে পারার আগেই স্যুমাইয়ার হাত থেকে ডেজার্ট ঈগলটা নিয়ে নিল।

'থ্যাংকস।' পিস্তলটা নেবার সময় ছোট্ট করে বলল সাইফ।

স্যুমাইয়া কথা বলল না। নীরবে পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল।

সাইফ ধারণা করতে পারল ব্যাপারটা। একটু আগেই করিমের জ্ঞান ফেরে। বুঝতে পারে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। আসল ঘটনা জানার জন্য অফিসরুমে আসতেই সাইফকে দাঁড়ানো দেখতে পায়। অফিসরুম থেকেই একটা ছুড়ি যোগার করে পেছন থেকে হামলা করতে চেয়েছিল সাইফের উপর।

নষ্ট করারমত সময় নেই। দারোয়ানের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, ‘গ্যারেজে আর কোনো গাড়ি আছে?’

‘একটা আছে।’

সাইফ কথানা বলে স্মমাইয়ার হাতে পিস্তলটা ধরিয়ে দিল। ওকে কাভার করতে বলে দারোয়ানকে ঝটপট বেঁধে ফেলল। ব্যবহার করা হল, করিমের জুতোর ফিতা।

বাঁধা হতেই, গ্যারেজে চলে এল ওরা দুজন। ঝকঝকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা সম্ভবত। ইউরির ব্যাক্তিগত। বেশ যত্নআত্তি করা হয়। গাড়িতে উঠে ইগনিশনের তারে কারিগরি ফলিয়ে স্টার্ট দিল সাইফ। গেট পেরিয়ে ছুটে চলল র্যামসিসের উদ্দেশ্যে।

স্মমাইয়ার মুখটা থমথম করছে। লক্ষ্য করতেই দেখতে পেল, মেয়েটা কাঁপছে অল্প অল্প। আন্দাজ করতে পারল কারণটা। জীবনের প্রথম চোখের সামনে কাউকে খুন করতে এবং হতে দেখে শক পেয়েছে মেয়েটা। সাইফ কিছু বলল না। এখন নীরবতাই অষুধের কাজ করবে। স্মমাইয়া নিজেও জানে, এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলনা ওর। এই খেলাটার নামই হল, “ডু অর ডাই”।

কিছুদূর চালিয়ে আসার পর চিড়িয়াখানার গেট চোখে পড়তেই গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল সাইফ।

স্মমাইয়া চোখ কপালে তুলে চাইল ওর দিকে। অবশ্যাম্ভী প্রশ্নটা আসার আগেই সাইফ বলে উঠল, ‘এই গাড়ি নিয়ে বেশিদূর যাওয়া যাবেনা। এখানে গাড়িটা লুকিয়ে রেখে ট্যাক্সি ধরে চলে যাব। এখানে অনেক গাড়ির ভীড়ে খুঁজে পেতে কিছুটা হলেও সময় বেশি লাগবে।’

গাড়িটা ছেড়ে দিল ওরা। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি নিয়ে গন্তব্যের পথ ধরল।

গতরাতে কিডন্যাপ হবার সময় ওয়ালেট সাথে নিতে পারেনি সাইফ। গন্তব্যে

পৌঁছে ট্যাক্সিকে দাঁড়াতে বলে ভেতরে চলে এল ওরা। ড্রয়িংরুমে বসে ছিলেন শেইখ সালাহউদ্দিন। মাথাটা দু হাতে টিপে নীচের দিকে মুখ করে আছেন। কপালে একটা ব্যান্ডেজবাধা। ওদের উপস্থিতি টের পেয়েই যেন একটা ঝাঁকি খেলেন। এই ক' ঘন্টার দুঃশ্চিন্তা একেবারে কাহিল বানিয়ে দিয়ে গেছে তাঁকে শারীরিক মানসিক দুভাবেই। কয়েক মুহূর্ত বোবাদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকে স্থমাইয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনের চোখেই পানি।

এমন সময় সাইফ বেরসিকের মত "খুক" করে কাশি দিল। পরস্পরকে ছেড়ে দিল ওরা।

'বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে, কাউকে দিয়ে ভাড়াটা দিয়ে পাঠালে ভাল হত।'

'ওহ, শিওর।'

কাজের লোককে পাঠালেন শেইখ সালাহউদ্দিন।

* * *

ডাইনিং টেবিলে বসে আছে ওরা তিনজন। প্রচন্ড ক্ষুধা পেয়েছে সবারই। খেতে খেতেই পুরো ঘটনা শেইখ সালাহউদ্দিনকে খুলে বলেছে সাইফ। শুনে চুপ মেরে
গেছেন ভদ্রলোক। বুঝতে পারছেন, কিসের ভেতর জড়িয়ে পড়েছে তারা।

'আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।' হঠাৎ বলে উঠলেন শেইখ সালাহউদ্দিন।

লজ্জা পেয়ে গেল সাইফ। এমনিতেই তাদের বিপদে ফেলে দিয়েছে ও। 'ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে ছোট করবেন না প্লিজ। আমার বরং লজ্জিত হওয়া উচিত। আমার জন্যই আপনারা ঝামেলায় পড়ে গেছেন।

শেইখ সালাহউদ্দিন হাসলেন। 'দেখুন, মি. সাইফ, নাসের আমাকে বলতে গেলে

রাস্তা থেকে তুলে এনে এই বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। তার অবদান এত সহজে শোধ হবার নয়। তবে আপনি যদি ভেবে থাকেন, শুধু নাসেরের প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকে আপনাকে সাহায্য করছি, তাহলে ভুল ভাববেন। এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের মানবতাবোধ থেকে করছি। আপনি যদি এতদূর থেকে প্রাণ হাতে করে আসতে পারেন, আমি আপনাকে সামান্য সাহায্য করতে পারব না? তবে আসল কথা হল, আমি আপনার তেমন কোনো কাজেই আসতে পারিনি। পিরামিডের সন্ধান দিলাম, তাও সেখানে ট্রেজার নেই।'

'নেই, তারমানে আর কখনই খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমন কোনো কথানেই।' সাইফ বলল। সালাহউদ্দিনের কথায় বুক থেকে একটা বড়সড় ভার নেমে গেছে। 'আমার বিশ্বাস ধাঁধাটার সমাধান করলেই ট্রেজারের হদিস বের করা সম্ভব।'

'হুম, তাহলে আপনার পরবর্তী প্ল্যান কী এখন?'

'এতদিন আমাদের প্রধান সমস্যা ছিল ট্রেজারের হদিস বেরকরা। তার সাথে এবার যুক্ত হয়েছে মোসাদ উপদ্রব। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের লোভ সামলানো বড়ই মুশকিল। ইউরি কিছুতেই হাল ছাড়বে না। সমস্ত লোকাল এজেন্টকে সতর্ক করে দিয়েছে নিশ্চয়ই এতক্ষনে। আবার হামলা চালাতে পারে ওরা। এজন্য আমার মতে আপাতত আপনাদের এই বাড়িটাতে থাকা নিরাপদ না।'

'তাহলে? আমাদের তো তেমন আত্মীয়স্বজনও নেই।'

'সেক্ষেত্রে হোটেলে থাকতে হবে আমার সাথে। বেশিদিন আশা করি থাকতে হবে না। ট্রেজার পেয়ে গেলেই বিপদ কেটে যাবে।' সাইফ জানে, ট্রেজার পাবার পরই আসল বিপদ শুরু হবে। মরিয়া হয়ে মোসাদ মরণকামড় দেবে তখন। তবে এখনই একথা বলে এদের ভড়কে দেবার ইচ্ছে নেই ওর।

খেই ধরল, 'হোটেলে থাকলে আরো বড় যে সুবিধাটা আমরা পাব সেটা হল, মোসাদ বড় ধরনের হামলা চালাতে সাহস পাবে না। হয়ত ট্রেজারের হদিস

পাবার জন্য আমাকে আবারও কিডন্যাপের অ্যাটেম্পট নিতে পারে।’ একটু থামল সাইফ। ‘তবে এবার আর আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবে না মোসাদ।’

শেষ কথাটা বলার সময় রহস্যময় একটুকরো হাসি ফুটে উঠল সাইফের ঠোঁটের কোনে।

Ebook Created by: Bangla Epub & Mobi Creator Team (fb group)

সাত

হোটেল গ্র্যান্ড হায়াত, কায়রো। সময়, দুপুর দুটো।

খানিক আগেই এই হোটেলে চেক ইন করেছে সাইফ, সুমাইয়া আর শেইখ সালাহউদ্দিন। নীল হিলটন ছেড়ে দিয়েছে নিরাপত্তার অভাবে। এই হোটেলও যে খুব বেশিক্ষন নিরাপদ থাকবে তা নয়। খুব শিঘ্রই মোসাদ জেনে যাবে ওরা কোথায় উঠেছে। তবে সাইফ যে প্ল্যানটা করতে চাইছে তাতে করে কিছুটা সময় প্রয়োজন। নতুন হোটেল সে সময়টুকু পাইয়ে দেবে ওকে।

তিনটে আলাদা আলাদা সিঙ্গেল রুম নিয়েছে ওরা। পোর্টার মালপত্র পৌঁছে দিয়ে গেল। যে রুমে ওরা এখন দাঁড়িয়ে সেটা শেইখ সালাহউদ্দিনের জন্য বরাদ্দ করাহল। খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছে। যার যার রুমে ফিরে যাওয়া চলে। সাইফের কিছু কাজ করতে হবে জরুরী। ওর নিজের ট্রাভেলব্যাগটা কাঁধে তুলে নিতে নিতে বলল, 'আপনারা যে যার রুমে ঢুকে লক করে রাখবেন দরজা। আমি ছাড়া কেউ এলে খুলবেন না। ডাকা ছাড়া রুম সার্ভিস এলে সরাসরি রিসেপশনে যোগাযোগ করবেন। এছাড়া যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে ফোন করবেন। আর আরেকটা কথা, আমরা যখন কেউ কারো রুমে যাব তখন দরজায় পরপর তিনটা টোকা দেব, একটু বিরতি দিয়ে আরো তিনটা, ঠিক আছে?'

সায় জানাল বাপ বেটি।

হঠাৎ জরুরী ব্যাপারটা মনে পড়তেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল সাইফের। এতক্ষন উত্তেজনায় খেয়ালই ছিল না। মনে মনে নিজেকে কষে একটা গালি দিয়ে সুমাইয়ার উদ্দেশ্য জানতে চাইল, 'আচ্ছা সুমাইয়া, আমাকে কাভার দেবার জন্য তখন আপনার হাতে পিস্তলটা দিয়েছিলাম, সেটা কোথায়?'

চিন্তায় পড়ে গেল মেয়েটা। মোহনীয় ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁট কামড়াল। তবে সাইফের কাছে এই মুহূর্তে মোটেও মোহনীয় লাগলো না ব্যাপারটা। বুঝতে পারছে, পিস্তলটা খুইয়েছে মেয়েটা। এই বিদেশ বিভুইয়ে এখন ও অস্ত্র যোগার করবে কোত্থেকে? তারউপর পেছনে পড়ে আছে মোসাদ।

'ওহ, মনে পড়েছে!' চিৎকার দিয়ে উঠল স্যুমাইয়া।

সাইফের বুক আবারও ছ্যাত করে উঠল, এবার আশায়।

'পিস্তলটা তো গাড়িতেই রেখে এসেছি?'

'ট্যাক্সিতে?'

'না না, প্রথমে যেটায় করে পালিয়েছিলাম।'

একই সাথে দু' রকমের অনুভূতি হল সাইফের। ট্যাক্সিতে পিস্তলটা ফেলে এলে ভাল বিপদই হত। এদিক থেকে বাঁচোয়া। তবে পিস্তলটা আনবার জন্য আবারও সেই গাড়ির কাছে যেতে হবে ভাবতেই দমে গেল মনটা। তবে অস্ত্রটা ওর চাইই।

আর কিছু বলল না সাইফ এ ব্যাপারে। 'ওকে, আই ইউল ম্যানেজ। আপনারা যে যার রুমে গিয়ে দরজা লক করে দিন।'

বেরিয়ে এল সাইফ রুম থেকে। চলে এল নিজের কামরায়। ব্যাগটা রেখেই কাজে নেমে পড়ল। কামরা ছেড়ে সামনের করিডোরে চলে এল। করিডোর ফাঁকা। ওর ঠিক পাশের রুমের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় কান পাতল সাইফ। ভেতর থেকে টিভির আওয়াজ আসছে। বোর্ডার আছে রুমে। এবার চলে এল ওর সরাসরি সামনের রুমের দরজায়। এখানেও দরজার ওপাশে মানুষের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। কিছুটা শংকিত হয়ে পড়ল সাইফ। আশেপাশে একটা খালি রুমের খুবই প্রয়োজন।

স্যুমাইয়ার রুমটা ওর ঠিক পাশেই। এবার কান পাতল স্যুমাইয়ার রুমের

সরাসরি সামনের রুমের দরজায়। ভেতরটা নিস্তব্ধ। তবে এখনই আনন্দিত হবার কিছু নেই। হতেপারে বোর্ডার কোথাও গেছে। শিওর হতে হবে।

সেলফোন বের করে ডায়াল করল হোটেলের রিসেপশনে। সাথেই সাথেই রিসিভ হল।

‘হোটেল গ্র্যান্ড হায়াত, কায়রো। মে আই হেল্প ইউ স্যর?’

‘আমি একটা রুম বুক করতে চাইছি।’ সরাসরি কাজের কথায় চলে এল।

‘শিওর স্যর, আপনি কবে চেক ইন করতে চান?’

‘আজই। এনিওয়ে, আপনাদের ২১৫ নাম্বার রুমটা কি খালি পাওয়া যাবে? ওটা আমার লাকি নাম্বার।’

‘উমম, একটু ওয়েট করবেন প্লিজ?’

ফোনের ওপাশ থেকে খটাখট আওয়াজ ভেসে এল। চেক করে দেখছে রিসিপশনিস্ট।

‘আমাদের সৌভাগ্য, স্যার, রুমটা এখনো খালি আছে।’ খানিক বাদেই স্খলিত কন্ঠে জানাল মেয়েটা।

‘ওহ, থ্যাঙ্ক গড।’

‘কী নামে বুক করব, স্যর?’

‘উইলিয়াম গ্রেসন, ফ্রম ইউএসএ।’

* * *

গত এক ঘন্টা ধরে শপিংমলে ঘুরে ঘুরে কয়েকটা জিনিস কিনেছে সাইফ। এর মধ্যে বেশিরভাগই ছদ্মবেশ ধারনের সরঞ্জাম। সব কিছু একটা ব্যাকপ্যাকে

ভরে উঠেএকটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল। আপাতত গন্তব্য চিড়িয়াখানা।

আধঘন্টা পর ট্যাক্সি গন্তব্যে পৌঁছল। ভাড়া মিটিয়ে পার্কিং এরিয়ায় চলে এল সাইফ। ট্যাক্সি থেকে নামার সময় সদ্য কেনা।হ্যাঁট আর সানগ্লাস চড়িয়েছে যথাস্থানে। আসল চেহারা ঠাহর করা মুশকিল।

ইউরির গাড়ি সকালে যেখানে রেখে গিয়েছিল, এখনো সেখানেই আছে। সম্ভবত পুলিশে রিপোর্ট করা হয়নি। কিংবা হলেও পুলিশ খুঁজে পায়নি। চিড়িয়াখানায় গাড়ি রেখে যাবার বুদ্ধি কাজে দিয়েছে। তবে গাড়ি থেকে পিস্তল বের করতে যাওয়ায় ঝুঁকি আছে। অন্য বুদ্ধি বের করতে হবে।

এদিক ওদিক চাইতেই কিছু ছেলে ছোকরাকে দেখা গেল। টুরিস্ট স্পটে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সাধারনত ভদ্রভাবে ভিক্ষাকরে এরা টুরিস্টদের কাছ থেকে। মাঝে মধ্যে টুকটাক দু একটা কাজ করেও কিছু কামাই করে। এরকম একটা ছেলেকে ইশারায় ডাক দিল সাইফ। ছেলেটা কাছে আসতেই পকেট থেকে একটা মিশরীয় একশ ডলারের নোট বের করল।

‘এটা পেতে চাও?’ নোটটা ছেলেটার চোখের সামনে দুলিয়ে বলল সাইফ।

চোখ চকচক করে উঠল ছেলেটার।

‘ওই যে গাড়িটা দেখছো, ওটার সামনের সীটে একটা পিস্তল আছে, ওটা নিয়ে আসতে হবে, পারবে?’ লোভ থাকতে থাকতে বলল সাইফ।

পিস্তলের কথা শুনেই ভয়ের একটা ছাপ পড়ল ছেলেটার চেহারায়। পরক্ষণেই টাকার অংক সমস্ত দ্বিধা ভুলিয়ে দিল। নিদেন পক্ষে এটা ওর তিনদিনের কামাই।

কিছু না বলে দৌড়ে চলে গেল ছেলেটা। খানিকবাদেই একটা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে ধাতব অস্ত্রটা নিয়ে এল। বুদ্ধি আছে ছোকরার। কারো চোখে পড়ে যাবার ভয়ে কাপড়ে পেঁচিয়ে এনেছে। খুশি হয়ে আরো পঞ্চাশ ডলার বখশিশ দিল সাইফ।

সবচাইতে ঝামেলার কাজটা ঝামেলা ছাড়া সম্পন্ন হতেই হাপ ছাড়ল সাইফ। পিস্তলটা ব্যাকপ্যাকে ভরে পার্কিং এরিয়া থেকে চলে এল চিড়িয়াখানার টয়লেটে। একটা কিউবিকলে ঢুকে ব্যাকপ্যাক খুলে প্রথমেই একটা আয়না বের করল। আয়না দেখে এরপর একে একে মাথায় সোনালী উইগ, চোখের উপর একই রঙের ভ্রু, চোখের মনিতে নীল কন্টাক্টলেন্স আর ঠোটের উপর পুরু গোঁফ লাগাল। গালের ভেতর ভরে নিল একটু করে রাবারপ্যাড। মুহূর্তেই অন্য মানুষে পরিণত হল সাইফ।

ছদ্মবেশ সম্পন্ন হতেই ব্যাকপ্যাক থেকে একটা ধ্যাদ্ধেরে পাসপোর্ট বেরুলো। দেখে মনে হবে বহুল ব্যাবহৃত। আসলে এর আগে পাসপোর্টটা কখনই ব্যাবহৃত হয়নি। হবার প্রশ্নও আসে না। কারন পাসপোর্টটা জাল। শিকাগোর এক নামকরা জালিয়াত তৈরি করে দিয়েছে জনৈক উইলিয়াম গ্রেসনের নামে। এয়ারপোর্টের জাল সিল-ছাপ্পড়ও মারা আছে। পাসপোর্টের ছবিটার সাথে সাইফের বর্তমান চেহারার প্রায় হুবুহু মিল। আয়না দেখে ছোটখাট দু একটা পরিবর্তন করে "প্রায়" সরিয়ে হুবুহু মিল নিয়ে এল ছবির সাথে। সাইফ এখন পরিনত হয়েছে আমেরিকান নাগরিক উইলিয়াম গ্রেসনে।

কাজ শেষ হতেই বেরিয়ে এল চিড়িয়াখানা থেকে। ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে তাকাতেই কৌতুকবোধ করল। একটু আগে যে ট্যাক্সিতে করে এখানে এসেছে, সেটাই এই মুহূর্তে সিরিয়ালে আছে। যাক ভালই হল। ছদ্মবেশটা ঝালিয়ে নেয়া যাবে।

‘হোটেল গ্র্যান্ড হায়াত।’ কড়া মার্কিন অ্যাকসেন্টে জানালার কাছে গিয়ে বলল সাইফ।

দ্বিতীয়বার আর ওর দিকে তাকাল না ড্রাইভার ওর দিকে। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠতে বলল।

হোটেল গ্রান্ড হায়াতের দিকে চলল উইলিয়াম গ্রেসন ওরফে সাইফ হাসান।

আট

নিজের অফিস রুমে অস্থির বাঘের মত পায়চারী করছে ইউরি কোলম্যান। রেগে বোম হিয় আছে। যেকোনো মুহূর্তে ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবার দশা আরকি! এর আগে শেষ কবে কেউ তাকে এতটা ঘোল খাইয়েছে, মনে করতে পারছে না সে। সাত আটজন গার্ডের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কী আশ্চর্য কৌশলেই না পালাল ছেলেটা। এতগুলো লোককে স্রেফ কাঁচকলা দেখিয়ে দিয়েছে। যাবার আগে ইউরির অন্যতম সেরা লোক করিমকেও মেরে রেখে গেছে।

মোবারক বসে আছে পায়চারীরত ইউরির সামনে। কাঁচুমাচু দেখাচ্ছে তাকে। একটু আগেই বসের ঝাড়ি খেয়েছে।

‘তোমরা এতগুলো লোক বসে বসে মাছি মারছিলে নাকি, অ্যাঁ?’ আবারও খেকিয়ে উঠল ইউরি কোলম্যান। ‘পালাল কিভাবে?’

উত্তর দেবার প্রয়োজনবোধ করল না মোবারক। উত্তরটা ইউরি নিজেও জানে।

এমন সময় ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠল ইউরির। স্ক্র্যাম্বলড ফোন। আড়ি পাতার সুযোগ নেই। সেলফোনে এই সুবিধাটা পাওয়া যায় না বলে জরুরী কথা ল্যান্ড ফোনেই সারে ইউরি। ফোনটা ধরে কিছুক্ষন ওপাশের কথা শুনল সে। মাথা ঝাঁকাল বার কয়েক। হু হা করে খানিকবাদে ফোন রেখে দিল। ততক্ষণে করোটের হাসি ফুটে উঠেছে তার ঠোঁটে।

‘খোঁজ পাওয়া গেছে ওদের।’ খুশি খুশি গলায় জানাল ইউরি। ‘গ্র্যান্ড হায়াতে উঠেছে ওরা।’

‘এখন তাহলে কী করতে চাইছেন, বস?’

‘উমম,’ কিছুক্ষন ভেবে নিল ইউরি। ‘দুটো পথ খোলা আছে এখন আমাদের

সামনে। প্রথমত, সাইফকে মেরে ফেলা। কারণ, ও আমাদের পরিচয় জেনে ফেলেছে। পুলিশে জানিয়ে দিলে ঝামেলায় পড়ে যাব আমরা। আমাদের এতদিনের নেটওয়ার্কটা ভেঙ্গে পড়বে। তবে আমার ধারণা ভুল না হয়ে থাকলে একাজ করবে না। সেক্ষেত্রে ওকেই বেশ কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। এক্ষেত্রে আরেকটা সমস্যাও আছে। সাইফকে মারলে ট্রেজারের আশা ছাড়তে হবে। আমি তাতে মোটেও রাজি নই।

আর দ্বিতীয় পথটা হল, স্থমাইয়াকে আবারও কিডন্যাপ করা। মুক্তিপন হিসেবে আমরা ট্রেজার দাবি করব।'

'সাইফকে কিডন্যাপ করলেই তো হয়। ও আমাদের কব্জায় থাকলেই তো ভাল। ওকে দিয়ে যেভাবে ইচ্ছে কাজ করিয়ে নেয়া যাবে।' মোবারক বলল।

'গাধা নাকি?' ধমকে উঠল ইউরি। 'এতদিনেও ওকে চিনতে পারোনি? ছোকরা "ভাঙ্গব তবু মচকাবো না" টাইপ। ওকে দিয়ে কিচ্ছু করানো যাবে না। গ্যাঁট হয়ে থাকবে। স্থমাইয়াকে কিডন্যাপ করে ওকে ইমোশনালি উইক করে ফেলতে হবে।'

'কিভাবে, স্যার? স্থমাইয়ার সাথে সাইফের কিসের সম্পর্ক?'

এবার আর খেকিয়ে উঠল না ইউরি। রহস্যময় একটা হাসি দিল শুধু।

জবাব না পেয়ে মোবারক প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'তাহলে কি মেয়েটাকে আবারও কিডন্যাপ করব?'

'অবশ্যই করবে। তবে সাবধান! এবার কিন্তু সাইফ অসতর্ক থাকবে না।'

***

রিসিপশনে ফর্মালিটিজ সম্পন্ন করে নিজের নতুন রুমে চলে এল উইলিয়াম

গ্রেসন ওরফে সাইফ হাসান। সাইফ জানে, ওদের বর্তমান ঠিকানা বেশিক্ষন ইউরির অজানা থাকবে না। তবে সেটা সাইফের ঠিকানা। উইলিয়াম গ্রেসনের ব্যাপারে কোনো মাথাব্যাথা থাকার কথা না মোসাদের।

উইলিয়াম গ্রেসনের ছদ্মবেশ খুলে আদি অকৃত্রিম সাইফ হাসান বনে গেল। ছদ্মবেশ খোলার আগে খুব ইচ্ছে করছিল গ্রেসন সেজে স্যুমাইয়ার রুমে নক করতে। মেয়েটা দরজা খুললেই "ভাউ" করে উঠবে! কল্পনায় স্যুমাইয়ার চেহারা সেই মুহূর্তে কেমন হতে পারে ভেবে হেসে ফেলল সাইফ।

ছদ্মবেশ খুলে বেরিয়ে এল রুম থেকে। হোটেলের নিজস্ব রেস্তোরাঁয় গিয়ে সাপার সেরে নিল। সন্ধ্যা হয়েছে বেশ আগেই। এখনই খাবার সেরে না নিলে পরে সময় পেতে নাও পারে। স্যুমাইয়া আর সালাহউদ্দিন রুমেই খাবার খেয়ে নেবে। তেমনই কথা হয়েছে।

খাবার শেষে সাইফ চলে এল পুরনো অর্থাৎ ওর নিজের রুমে।

সেমি অটোমেটিক ডেজার্ট ঈগল পিস্তলটা কোমরে গোঁজা ছিল। রুমে ঢুকে বের করে একবার চেক করে নিল। সাতটা বুলেটই যথাস্থানে আছে। একটু পর সন্তুষ্ট হয়ে সেফটি ক্যাচ অন করে ফের কোমরে গুজে রাখল।

এবার পকেট থেকে বের হল পিচ্চি একটা বস্তু। দুই ইঞ্চি ব্যাসার্ধের গোলাকার আকৃতির বস্তুটা একটা ব্লুটুথ ক্যামেরা। ত্রিশ ফুট দূরত্ব থেকে যেকোনো ব্লুটুথযুক্ত ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করা যায়। ক্যামেরাটা চালু করে ওর সেলফোনের সাথে কানেক্ট করল সাইফ। সাথেই সাথেই স্ক্রিনে ছবি ফুটে উঠল। বেশ হাই রেজুলেশন ক্যামেরা। সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটা সেলফোনের সাহায্যে দূর থেকে অপারেটও করতে পারবে সাইফ।

ক্যামেরাটা রুম থেকে বারান্দায় যাবার দরজার মাথায় আটকে দিল সাইফ। লেন্সটা রইল বারান্দার দিকেই। ছোট্ট যান্ত্রিক চোখটা সহসা কারো চোখে পড়ার সম্ভবনা নেই। বিশেষ করে আগে থেকে জানা না থাকলে। আর জেনে ফেললেও

সমস্যা নেই। ততক্ষনে সাইফের কাজ হয়ে যাবে। এখন ওর চোখ এড়িয়ে কেউ বারান্দা দিয়ে রুমে ঢুকতে পারবে না।

এরপর চলে এল বিছানার কাছে। কোল বালিশ আর কম্বলের সাহায্যে একজন ঘুমন্ত মানুষ প্রতিকৃতি তৈরি করল বিছানায়। রুমের লাইটটা অফ করে দিলে বারান্দা দিয়ে চুইয়ে আসা আলোয় বোঝা অসম্ভব, এখানে সাইফ শুয়ে নেই।

এ ঘরের কাজ শেষ। বেরিয়ে যাবার আগে শেষবারের মত একবার চোখ বুলিয়ে নিল গোটা রুমে। কোনো খুঁত চোখে পড়ল না। লাইট নিভিয়ে দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে চলে এল নতুন রুমটাতে। রুমে ঢুকে দরজা পুরোপুরি লাগাল না। চুল পরিমাণ ফাঁক রয়ে গেল। একটা চেয়ার নিয়ে দরজার সামনে রাখল। এক হাতে ডেজার্ট ঈগল আর অপর হাতে সেলফোন নিয়ে বসে পড়ল চেয়ারটাতে। দরজার ফাঁকটাতে চোখ রাখতেই পুরনো রুমের দরজা দেখা গেল। এদিকে হাতের সেলফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে বারান্দার ছবি। সামনে কি পেছনে, কোনো দিক থেকেই ওই রুমে সাইফের চোখ এড়িয়ে কারও অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়।

সাইফ বাজি রেখে বলতে পারবে, মোসাদ চুপ করে বসে থাকবার নয়। ওর উপর একটা হামলা চালানো হবেই। সাইফ যেহেতু ওদের পরিচয় জেনে ফেলেছে সুতরাং ট্রেজারের লোভে না হলেও অন্তত ওর মুখ বন্ধ রাখবার জন্য শেষ একটা আঘাত মোসাদ হানবেই। সেটা কবে জানে না। তবে সেজন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকবার বান্দা নয় সাইফ। আসুক ওরা যখন, যেভাবেই-সাইফ প্রস্তুত।

***

তিনঘন্টা পর। রাত একটা বিশ। হোটেলের গ্রান্ড হায়াত এর পেছনের গলিতে নিঃশব্দে থেমে দাঁড়াল মিশমিশে কালো রঙের একটা গাড়ি।

তিনজন আরোহীদের মধ্যে দুজ' ন নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। মোবারক আর শরীফ সাবরি। শরীফ বিশাল দেহের অধিকারী। গরিলার মত দু' বাহুতে অসুরের শক্তি। সাইফের মত হ্যাঁন্ড টু হ্যাঁন্ড কমব্যাটে পারদর্শীও দু' বার ভাববে এই গরিলার সাথে ঝামেলায় জড়াতে।

আগে রাস্তার গুন্ডা ছিল শরীফ। একটা মামলায় ফেঁসে গিয়ে ছ'বছরের জেল হবার উপক্রম হয়েছিল। ইউরি তাকে ছাড়িয়ে আনে জেল থেকে। ইউরির এজেন্সীতে যারা কাজ করে তাদের সবাই কোনো না কোনো ভাবে ঋণী ইউরির কাছে। ইসরাইলের সাথে মিশরের হিম শীতল সম্পর্কের কারণে এখানে পুরোপুরি স্থানীয় লোক দিয়ে অপারেট করে মোসাদ। ইউরি নিজেও মিশরীয় ভুয়া পরিচয়ে গাইড এজেন্সির ব্যবসা চালায়।

সাইফকে যে কৌশলে কিডন্যাপ করা হয়েছিল, সুমাইয়াকে সেভাবে করা সম্ভব না। কিছুটা ঝুঁকি নিতেই হচ্ছে মোবারক আর শরীফকে।

বিশাল হোটেল ভবনের চারপাশে কোনো বাউন্ডারি ওয়াল নেই। তবে সিসিটিভি রয়েছে ভবনের চারপাশেই। তবে বিশেষ একটা সিসিটিভি সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। প্রচুর টাকা এবং প্রভাব খাটাতে হয়েছে ইউরিকে এজন্য।

কাঁধ থেকে দড়ির মই নামাল শরিফ। মইয়ের এক মাথায় লোহার হুক লাগানো রয়েছে। জায়গাটা নির্জন, এরপরও চারদিকটা দেখে নিয়ে মইটা দোতলার বারান্দার রেলিং লক্ষ্য করে ছুঁড়ল শরীফ। এটাই সুমাইয়ার রুমের বারান্দা। ওদের কন্টাক্ট নিশিচত করেছে।

প্রথমবার মইটা জায়গামত বাঁধাতে ব্যর্থ হল শরীফ। রেলিং এ বাড়ি খেয়ে নীচের দিকে সরসর করে নেমে এল মইটা। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করল। এবার কাজ হল। রাবার মোড়া থাকলেও মৃদু টং শব্দ করে উঠল হুকটা রেলিং এ বাড়ি লেগে।

আঁধারে দ্রুত মই বেয়ে উঠে যেতে লাগল দুটো ছায়ামূর্তি।

* * *

প্রায় তিন ঘন্টা ধরে ঠায় বসে আছে সাইফ। একাধারে কী-হোল আর সেলফোনের স্ক্রিনে চোখ রাখতে রাখতে ও ক্লান্ত। কয়েকবার করেই মনে হল, আজ আর কেউ আসবে না, ঘুমিয়ে পড়ি। পরক্ষনেই চোখ রাঙ্গিয়েছে নিজেকে। বুঝিয়েছে, হাল ছাড়া তো তোমার স্বভাব নয়। এখন তবে এতটুকুতেই অস্থির হচ্ছ কেন?

কিছুক্ষন পর সাইফ উঠে দাঁড়াল। বসে থেকে কোমর ধরে গেছে। জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত পা খেলিয়ে নেয়ার ইচ্ছে। সাইফ উঠে দাঁড়াতেই মৃদু একটা "টং" আওয়াজ পেল। দু সেকেন্ড লাগল বুঝতে যে, শব্দটা ওর হাতে ধরা ফোন থেকেই এসেছে।

সাইফ আর স্যুমাইয়ার রুম পাশাপাশি হওয়ায় হুকের সাথে রেলিং এর সংঘর্ষে তৈরি হওয়া মৃদু টং শব্দটা ক্যামেরার যান্ত্রিক কান এড়ায়নি। শব্দটা চিনতেও ভুল হয়নি সাইফের। এই জিনিস ও নিজেও ব্যাবহার করেছে ট্রেনিং এর সময়।

স্নায়ু টানটান হয়ে গেল সাইফের। গভীর মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইল স্ক্রিনের দিকে। অপেক্ষা করছে শত্রুর উপরে উঠে আসার।

পাঁচ মিনিট কেটে যাবার পরও যখন কেউ উঠে এল না, তখনই বিদ্যুৎচমকের মত বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। শত্রুরা ওকে নয় স্যুমাইয়াকে কিডন্যাপ করতে এসেছে!

'শিট!' নিজেকে কষে একটা গাল দিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুলে ফেলল সাইফ। হাতে উদ্যত পিস্তল। এক নজরে করিডোর দেখে নিল। কেউ নেই। ক্ষীপ্র চিতার মত স্যুমাইয়ার রুমের দরজার সামনে চলে এল। কান পাততে হল না,

দরজার সামনে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে মেয়েলি কন্ঠের অস্ফুট আর্তনাদ ভেসে এল। শত্রু ঢুকে পড়েছে স্যুমাইয়ার রুমে! এখন কিছু করতে যাওয়া খুবই বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে মেয়েটার জন্য।

স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল সাইফ। অনেক দেরী করে ফেলেছে ও।

নয়

ডিনার সেরে বেশ আগেই শুয়ে পড়েছে সুমাইয়া, কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। যেন আড়ি নিয়েছে ওর সাথে। কিছুতেই ধরা দিচ্ছে না।

ছোটবেলা থেকেই থ্রিলারের পোকা সুমাইয়া। ভুতটা এসেছিল নাসের বিন ইউসুফের কাছ থেকে। জার্নালিজমে পড়ার কারনও এটাই। দেশের সবচাইতে নামকরা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট হতে চায় ও। তবে এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এত সহজ কিছু না। শুধু উত্তেজনাই নয়, এই লাইনে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাতে হয় জীবনটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে।

সাইফের কথা ভাবলেই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে সুমাইয়া। কী আশ্চর্য কৌশলে তাকে নিয়ে পালাল। আর বিপদের মুহূর্তেও ঠোঁটের কোনে এক টুকরো স্মিত হাসি অভয় দিতে থাকে সবসময়। কেমন যেন রহস্যময়। চেহারার লাজুক ভাবটা দেখলে মনে হয় এই লোকের বন্ধুত্ব পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আবার সংকটের সময় তার চেহারায় যে ইস্পাত কঠোর দৃঢ়তা ফুটে ওঠে সেটা দেখে ধারণা করা যায় এর শত্রু হওয়া বড় ধরনের দুর্ভাগ্যই বটে। ওদের রুমে দিয়ে যাবার পর আজ সারাদিনে একবারও দেখা হয়নি মানুষটার সাথে। কী করছে কে জানে? তবে নিশ্চয়ই ঘুরে টুরে বেড়াচ্ছে না।

বিছানায় শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল সুমাইয়া। সব ভাবনাই ঘুরে ফিরে সাইফ কেন্দ্রীক হয়ে পড়ছে দেখে একটু লজ্জা পেল। তবে অস্বীকার করতে চাইল না, মানুষটাকে ওর ভাল লেগে গিয়েছে। ভাল লাগাটা কোন পর্যায়ের সে ব্যাপারে অবশ্য ও নিজেও পরিষ্কার জ্ঞাত না।

সুমাইয়া আরো একটা ব্যাপারে জ্ঞাত না। বারান্দা থেকে যে দুটো ছায়ামুর্তি নিঃশব্দে তার রুমে প্রবেশ করেছে সেটা ঘুনাক্ষরেও টের পেল না সুমাইয়া।

যখন টের পেল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে।

ধড়মড় করে উঠে বসে চিৎকার করতে চাইল, তার আগেই একটা নিষ্ঠুর হাত মুখ চেপে ধরল ওর। এর আগেই চাপা একটা আর্তনাদ করতে পেরেছে ও। এই আওয়াজটাই সাইফ বাইরে দাঁড়িয়ে শুনেছিল। তবে এই মুহূর্তে ওকে খুঁজলে ওখানে পাওয়া যাবে না।

'ম্যাডাম, আপনি বুদ্ধিমতি, আমাদের সাথে ভালয় ভালয় গেলে আমাদের সবারই মঙ্গল। আপনার কোনো ক্ষতি করা হবে না। সাইফ ট্রেজার আমাদের হাতে তুলে দিলেই আপনাকে ছেড়ে দেয়া হবে।' মৃদু গলায় বলল মোবারক।

আতঙ্কে জ্ঞান হারাবার উপক্রম হল সুমাইয়ার। আজই এত ঝক্কি করে পালাল আর আজই আবার কিডন্যাপ!

'বারান্দায় মই লাগানো আছে, চুপচাপ নেমে যাবেন আমাদের সাথে। নইলে বাধ্য হয়েই আপনার বাবার সাথে খারাপ ব্যাবহার করতে হবে আমাদের। আমরা জানি, তিনি এখন পাশের কামরাতেই ঘুমোচ্ছেন।'

যাও বা একটু প্রতিরোধের ইচ্ছে ছিল, শেষ কথাটা শুনে ইচ্ছেটা বেমালুম উবে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সুমাইয়া।

পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে সুমাইয়াকে নিয়ে গাড়িতে পৌঁছে গেল মোবারক আর শরীফ। ওরা ওঠে বসতেই গাড়িটা রওনা হয়ে গেল। মোবারক সুমাইয়ার পাশে বসে পিস্তল তাক করে রেখেছে ওর দিকে।

গাড়িতে বসার পর একটা ব্যাপার উপলব্ধি করে অবাক হয়ে গেছে সুমাইয়া। ওর যতটা ভয় পাওয়া উচিৎ ছিল, ততটা ভয় ও পাচ্ছে না। কেবলই মন হচ্ছে, সাইফ ওকে উদ্ধার করবেই। যদিও ধারনাটার পেছনে জোরালো কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে না। যে মানুষটাকে আজ সারাদিন চোখেই দেখেনি সে কিভাবে ওকে উদ্ধার করবে। ও যে কিডন্যাপ হয়েছে, এটা জানতেই তো রাত

পেরিয়ে যাবে। মোসাদ হয়ত এবার ওকে সেই আগের জায়গায় নাও রাখতে পারে। আর রাখলেও ওই দুর্ভেদ্য বাড়িটা থেকে ওকে উদ্ধার করবেই বা কিভাবে? এবার নিশ্চয়ই মোসাদ আগের চাইতে অনেকগুন সতর্ক থাকবে।

আচমকা কড়া ব্রেক কষায় সম্বিৎ ফিরে পেল স্যুমাইয়া। কী হল? এত তাড়াতাড়ি তো পৌঁছে যাওয়ার কথা না। সামনে তাকাতেই কারনটা বুঝতে পারল। এই রাস্তাটা বেশ নির্জন। ওদের থেকে কিছুটা দূরে এক বিদেশী টুরিস্ট দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। সম্ভবত ইয়োরোপ কিংবা আমেরিকান হবে। চেহারা দেখা যাচ্ছে না। চাপ দাড়িতে ঢাকা পড়েছে। তবে মাথার চওড়া ব্রিমের হ্যাঁট আর বেশভুষা সেরকমটাই বলছে। পাশেই একটা গাড়ি দাঁড় করানো। সম্ভবত নষ্ট হয়ে গেছে, ওদের কাছে লিফট চায়। লোকটা এমনভাবে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে, ড্রাইভার ইচ্ছে থাকা সত্বেও পাশ কাটাতে পারেনি।

গাড়ি থামতেই বিদেশী লোকটা এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। মোবারক পিস্তলটা পকেটে ভরে ফেলল।

লোকটা জানালার পাশে মাথা নামিয়ে মার্কিন টানে বলল, 'আমার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে, একটা লিফট পেলে খুব উপকার হত।'

'মিস্টার, আমরা একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি, লিফট দেয়া সম্ভব না, সরি।' মোবারক জানাল।

'ও তাহলে আর কী করা।' হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল লোকটা।

সবাই বেশ অবাক হয়েছে। এই লোকের হাত থেকে এত সহজে ছাড়া পাওয়া যাবে কেউ ভাবেইনি।

তবে লোকটার কথা শেষ হয়নি। আগের কথার খেই ধরে বলল, 'ঠিক আছে, তোমরা যাও, কিন্তু মেয়েটাকে রেখে যাও।'

চোখ কপালে উঠে গেল স্যুমাইয়া সহ গাড়ির বাকি আরোহীদের।

‘হোয়াট দ্যা হেল...,’ কথাটা শেষ করতে পারল না মোবারক। লোকটার হাতে ভোজবাজির মত বেরিয়ে এসেছে একটা অস্ত্র। ডেজার্ট ঈগল! লোলূপ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে মোবারকের দিকে।

অস্ত্রটাই ধারকের পরিচয় জানিয়ে দিল স্থমাইয়াকে। ‘সাইফ হাসান!’ অস্ফুটে বলে ফেলল স্থমাইয়া।

ঝট করে একবার স্থমাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়েই আবার সাইফের দিকে নজর দিল মোবারক। চোখে মুখে নগ্ন অবিশ্বাস খেলা করছে।

‘সাইফ হাসান!’ প্রশ্ন না মন্তব্য বোঝা গেল না।

‘নিঃসন্দেহে।’ হাসল সাইফ। ‘ওকে, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আগামী পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে যদি স্থমাইয়াকে গাড়ি থেকে নামিয়ে না দাও তাহলে একটা ম্যাসাকার ঘটে যাবে। আমার হাতে যে এটা খেলনা নয় তা তো বুঝতেই পারছো।’

সেকেন্ড গুনতে হল না। তার আগেই স্থমাইয়াকে বের করে দিল মোবারক। ওরাও জানে, গাড়ির ভেতর থেকে গোলাগুলীতে মোটেও স্থবিধে করতে পারবে না। পিস্তল বের করবার আগেই সাইফ তিনজনকেই ঝাঁঝরা করে দিতে পারবে।

স্থমাইয়া নামার পর সাইফ ওর হাতে কালোমতন কী একটা জিনিস ধরিয়ে দিয়ে বলল, ‘এটা গাড়ির পেছনে লাগিয়ে দিয়ে আস্থন। চুম্বক লাগানো আছে, ধরলেই লেগে যাবে।’

আধো অন্ধকারে গাড়ির আরোহীরা বুঝতে পারল না জিনিসটা কী।

স্থমাইয়া বস্তুটা হাতে নিয়ে বেকুবের মত তাকিয়ে রইল সাইফের দিকে।

‘জলদি করুন।’ তাড়া দিল সাইফ।

সুমাইয়া আর ইতস্তত করল না। জিনিসটা নিয়ে গাড়ির পেছন দিকে চলে গেল। কয়েক সেকেন্ড বাদেই যখন ফিরে এল, হাতের বস্তুটা আর দেখা গেল না।

'শোনো, মোবারক, ইচ্ছে করলে তোমাদের এখানেই মেরে রেখে যেতে পারতাম। তবে ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে আমার মোটেও ভাল লাগে না। এ যাত্রায় বেঁচে গেলে। তবে তোমাদের মত দুই পয়সার গুন্ডাদের বিশ্বাস করতেও আমি রাজি নই। তোমাদের ছেড়ে দিলে কিছুদূর গিয়ে গাড়ি থামিয়ে হামলা করবে না তার নিশ্চয়তা কি?'

কোনো নিশ্চয়তা নেই। মোবারক সেটাই করতে চাইছিল। কিন্তু এই ব্যাটা সেটা কিভাবে বুঝল ওর মাথায়ই ঢুকল না!

'সেজন্য তোমাদের গাড়ির পেছনে একটা শক্তিশালী বম্ব ফিট করে দিলাম। আমার দৃষ্টিসীমা পেরোনোর আগে যদি তোমাদের গাড়ির গতি ষাটের নীচে নামতে দেখি, সোজা বম্ব লক্ষ্য করে গুলী করব। ভেবো না, লাগাতে পারব না। অবশ্য লাগাতে না পারলেও ক্ষতি নেই। বোমাটা অত্যন্ত সেনসিটিভ। গুলীর কারণে সৃষ্ট শক ওয়েভেই ব্লাস্ট হয়ে যাবে। পরিনাম, বুঝতেই পারছো, স্রেফ কিমা হয়ে যাবে!' ভয়াবহ একটা হাসি ফুটে উঠল সাইফের ঠোঁটে।

'আর হ্যাঁ, ইউরিকে আমার পেছনে লাগতে মানা করে দিও। অন্তত তোমাদের মত সস্তা গুন্ডা পান্ডা নিয়ে। এখন লেজ তুলে ভাগো, যাও।'

ড্রাইভার বোমার কথা শুনে ভয়ে ভিড়মি খেয়ে গেছে। গাড়ি স্টার্ট দিতেও ভয় পাচ্ছে। যদি ব্লাস্ট হয়ে যায়!

'গো!' গর্জে উঠল সাইফ।

আর ইতস্তত করল না ড্রাইভার। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই লেজ তুলে পালাল।

গাড়িটা দৃষ্টিসীমা পার হতেই সুমাইয়া জামার হাতা থেকে সেই কালোমত বস্তুটা

বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'এই নিন, আপনার স্যুপার সেনসিটিভ বম্ব!'

হাত বাড়িয়ে নিজের সেলফোনটা নিল সাইফ। 'বম্ব না হলেও সেনসিটিভ যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' হেসে বলল।

'হুম, যেভাবে লেজ পড়িমরি করে পালাল! তা আপনি জানলেন কিভাবে ওরা আমাকে আবার কিডন্যাপ করেছে?'

'ওদের বিশ্বাস নেই, কিছুদূর গিয়ে ইউটার্ন নিয়ে ফিরে আসতে পারে। গাড়িতে উঠুন, যেতে যেতে বলছি।'

গাড়িতে উঠে বসল ওরা দুজন। ড্রাইভ করতে করতে সব খুলে বলল সাইফ।

চোখ বড় বড় করে শুনে গেল স্যুমাইয়া। সাইফ থামতেই প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, যখন বুঝতে পারলেন ওরা আমার রুমে ঢুকে পড়েছে, তখন কী করলেন?'

'তখন আসলে কিছুই করার ছিল না। হঠাৎই বুদ্ধিটা আসে। রুমে ছদ্মবেশ ধারনের বাড়তি কিছু জিনিস কিনে রেখেছিলাম। ওগুলো নিয়ে সোজা হোটেলের পার্কিং এরিয়ায় চলে আসি। গিয়ে দেখি এক লোক গাড়ি থেকে নামছে। গিয়ে বললাম, আপনার গাড়িটা আমার দরকার।'

'আপনি গিয়ে বললেন, আর লোকটা দিয়ে দিল?' আবারও বিস্ময়ে চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেল স্যুমাইয়ার।

'উহু, দিল না। শেষে মাথায় সামান্য এক গাট্টা মারতে হল। মাপা মার। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই জ্ঞান ফিরবে। এরপর গাড়ি নিয়ে চলে এলাম হোটেলের পেছনে। সেখানে মোবারকদের গাড়িটা রাখা ছিল। গাড়ি চিনে নিয়ে আপনাদের আগেই এখানে পৌঁছে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাকিটা তো জানেনই।'

হোটেলে পৌঁছে গিয়েছে বলে আর কোনো কথা হল না। গাড়িটা নিয়ে পার্কিং এরিয়ায় চলে এল। গাড়ির মালিককে অন্য একটা গাড়ির আড়ালে শুইয়ে রেখে গিয়েছিল সাইফ। যথাস্থানেই পাওয়া গেল তাকে। যদি আদৌ সেটাকে যথাস্থান

বলা যায় আরকি! জ্ঞান এখনো ফেরেনি দেখে সস্তিবোধ করল সাইফ। গাড়ি জায়গামত রেখে যে যার রুমে চলে এল।

রাত বেশি বাকি নেই।

দশ

পরদিন।

আড়মোড়া ভেঙ্গে বিছানা ছাড়ল সাইফ। মাথায় কিছুটা চিন চিনে ব্যাথা। কাল রাতে ঘুম কম হবার ফল। মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাথাটা যেন সরিয়ে দিতে চাইল সাইফ। হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। নীল হিলটনের মত না হলেও এই রুম থেকেও নীলনদ দেখা যায়। সুবিশাল। সমুদ্রের মত। তবে সমুদ্রের কাছে গেলে কেমন একটা নোনা গন্ধ পাওয়া যায়। নীলে যেটা অনুপস্থিত। নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকলেও সাইফের মস্তিষ্ক প্রবল বেগে কাজ করে যাচ্ছে। সময় দ্রুত বয়ে চলছে অথচ আসল কাজেরই কোনো অগ্রগতি নেই। ধাঁধার সমাধান করতে না পারলে ট্রেজার পাবার সম্ভবনা কম। ধাঁধা নিয়ে ভাবার সময়ই পাচ্ছে না মোসাদের উপদ্রবে। একেবারে আঠার মত লেগে আছে। এদের কিভাবে খসাবে বুঝতে পারছে না সাইফ। এদিকে সুমাইয়া আর ওর বাবাও একটা চিন্তার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর। ওদের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখতে রাখতেই অনেকটা মূল্যবান সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দায়টা এড়িয়েও যেতে পারে না সাইফ। ও-ই তাদের এই বিপদের মধ্যে টেনে এনেছে। ট্রেজার উদ্ধারে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে হলে এদের ভাবনা মাথা থেকে সরাতে হবে।

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সাইফ। জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে রুম ছাড়ল। সংকেত অনুযায়ী টোকা দিল সুমাইয়ার দরজায়।

* * *

তাকানো যাচ্ছে না ইউরি কোলম্যানের চোখের দিকে। টকটকে লাল হয়ে আছে ওদুটো। চেহারা ভীতিকর ক্রোধে কুৎসিত দেখাচ্ছে। হাতে একটা পিস্তল নিয়ে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারী করছে। টেনশনে থাকলে ইউরি এভাবেই অস্থির প্রেতাত্মার মত হেটে বেড়ায় সারা ঘরে। তবে আজকের অস্থিরতা ছাপিয়ে গেছে অতীত ইতিহাস।

এক সময় ঘুরে দাঁড়িয়ে ফেটে পড়ল রাগে।

'সাইফ ঠিকই বলেছে। তোমাদের মত সস্তা গুন্ডাপান্ডা নিয়ে ওর পেছনে লাগতে যাওয়া মোটেও উচিৎ হয়নি আমার।'

নীরবে অপমান হজম করে গেল মোবারক সহ রুমে উপস্থিত প্রতিটা মানুষ। মাথা নীচু করে আছে।

'একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করতে পারো না, ছিহঃ!'কথাটা বলেই আবার পায়চারী করতে লেগে গেল ইউরি।

'বস, মেয়েটাকে আবার কিডন্যাপ...,' ইউরিকে ঝট করে ঘুরে তাকাতে দেখেই চুপ মেরে গেল মোবারক।'

'কথা শেষ করো।' জলদগম্ভীর স্বরে আদেশ দিল ইউরি।

'না বলছিলাম যে, মেয়েটাকে আরেকবার কিডন্যাপ করব কিনা?'

'হা হা হা!' ইউরির কপট হাসিতে গম গম করে উঠল মাঝারি আকৃতির কামরাটা।'এবার কিডন্যাপ করতে গেলে আর পিঠের চামড়া নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। আগেরবার তো "সুপার সেনসিটিভ বম্ব' এর ভয় দেখিয়েছিল, এবার নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডের ভয় দেখাবে, মূর্খের দল সব!'

'বস, সত্যিই ওর হাতে বোম ছিল।' মুখ কাঁচুমাচু করে জানাল মোবারক।'

'ওটা বোম ছিল, কি করে বুঝলে? এরকম বোমার কথা শুনেছো কখনো? আর

থাকলেও এত হাইলি সফিসটিকেটেড বোমা সাইফ পাবে কিভাবে? ও কি এখনো আর্মিতে আছে?'

চুপ হয়ে গেল মোবারক।

কিছুক্ষন পর সাহস সঞ্চয় করে বলেই ফেলল, 'বস, এখন তাহলে কী করব আমরা?'

'তোমাদের কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করব। 'বলতে বলতে ক্রুর হাসি ফুটে উঠল ইউরি কোলম্যানের মুখে।

'যত দ্রুত সম্ভব আমার ইসরাঈলে যাবার ব্যাবস্থা করো।'

* * *

ব্রেকফাস্ট করতে করতে সব কিছু জেনে রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন শেইখ সালাহউদ্দিন। তার ঠিক পাশের রুমেই এত কিছু ঘটে গেছে গতরাতে, ভাবতেই অবাক লাগছে।

হোটেলের রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছে তিনজন। মোসাদ ওদের ঠিকানা জেনে ফেলেছে, লুকিয়ে থেকে এখন আর কোনো লাভ নেই। এজন্য নিজেদের গৃহবন্দি করে রাখার নির্দেশ তুলে নিয়েছে।

'পরিস্থিতি তো দেখছি জটিল রূপ ধারন করেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সাইফ। স্থমাইয়া চুপচাপ খাচ্ছে।

'এখন কী করার?' প্রশ্ন করলেন সালাহউদ্দিন।

মুখের খাবারটা গিলে নিয়ে সাইফ বলল,'ট্রেজার না পাওয়া পর্যন্ত কিছু করার নেই। ট্রেজার উদ্ধারের আশা একেবারেই না থাকলে আমি ফিরে যেতাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ধাঁধার সমাধান করতে পারলে সন্ধান মিলবে ট্রেজারের। আগামী

ক'টা দিন খুব ঝামেলার হতে পারে। আমার পরামর্শ হল, আপনারা সম্ভব হলে কায়রো ছেড়ে আপনাদের কোনো আত্মীয়র বাড়িতে চলে যেতে পারেন। মোসাদের চোখ এড়িয়ে আমি নিজে আপনাদের পৌছে দিয়ে আসতে পারব।'

'আমরা না থাকলে কি ওরা আপনার কোনো ক্ষতি করবে না?'

'না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তবে নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু আপনারা থাকলে আপনাদের নিরাপত্তার দিকটাও তো আমাকেই দেখতে হবে।'

'দেখুন মি. সাইফ, আপনাকে আগেও বলেছি, আবারও বলি, শুধু নাসেরের কাছে কৃতজ্ঞ বলেই আমি আপনাকে সাহায্য করছি না। নৈতিক দায়িত্ব থেকে কাজটা করছি। আমার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের যাবার মত তেমন কোনো জায়গাও নেই। আমরা থাকলে আপনার কাজে সমস্যা হলে সেক্ষেত্রে আমরা দুজন র্যামসিসে ফিরে যেতে পারি। তুই কী বলিস, স্নমাইয়া?'

স্নমাইয়ার দিকে তাকাল সাইফ। মেয়েটা খাওয়া ফেলে গভীর মনোযোগে পত্রিকায় কী যেন দেখছে। মিশরের জাতীয় দৈনিক আল আহরাম। বাবার ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল।

'কী বলছিলে যেন, বাবা?'

হেসে ফেললেন সালাহউদ্দিন।'না কিছু না, তুই পত্রিকা পড়। তোর ছবি ছাপিয়েছে নাকি? যে খেল দেখালি দুদিনে।'

'খেল কি আমি দেখিয়েছি? ছবি ছাপলে তো ওঁর ছাপবে।' সাইফের দিকে ইশারা করে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। সাথে সাথেই আবার পত্রিকায় ডুব দিল।

লজ্জা পেয়ে গেল সাইফ। প্রশংসায় নাকি স্নমাইয়ার হাসিতে, বলা মুশকিল।

লজ্জা কাটাবার জন্যই যেন বলে উঠল,'আপনারা যদি থাকতে চান তাহলে

আমার আপত্তি নেই। আমি আপনাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বলেছিলাম। যাকগে, আপাতত হোটেলেই থাকুন, দু'একদিন পর পরিস্থিতি বুঝে না হয় বাড়ি ফেরা যাবে।'

'ওকে, যেমনটা ভাল হয়।'

'আমি তাহলে উঠি।'সাইফের খাওয়া শেষ। এখন রুমে ফিরে বারান্দায় একা একা বসে ধাঁধাটা নিয়ে ভাববে।

সায় জানালেন শেইখ সালাহউদ্দিন।

সাইফ উঠে দাঁড়াবে এমন সময় স্থমাইয়া পত্রিকায় চোখ রেখেই অন্যমনস্ক হয়ে ওর হাত চেপে ধরল।

চমকে গেল সাইফ।

'কী হয়েছে।' আবার বসে পড়ে জানতে চাইল।

'এটা পড়ে দেখুন।' হাতের পত্রিকাটা বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

হাতে নিল সাইফ। শিশু কিশোরদের বিভাগে একটা ধাঁধা ছাপা হয়েছে, সেটাই পড়তে বলছে স্থমাইয়া।

পড়ল সাইফ, এবং কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে থ হয়ে গেল।

ধাঁধাটার ভাবার্থ করলে দাঁড়ায়,'ছোট্ট নাগিব একবার তার পোষা ঘোড়াকে নিয়ে বেড়াতে বের হল। পথে একটি নালা পড়ল। চওড়ায় প্রায় ৫ ফুট। ঘোড়াটা সেই নালা লাফিয়ে পার হয়ে গেল। বাচ্চা ঘোড়াটার পক্ষে এই দুরত্ব লাফিয়ে পার হওয়া বেশ বড় ব্যাপার, তাই নাগিব বাসায় ফিরে বাবাকে এই ঘটনা উল্লেখ করে বলল, "আমাদের ঘোড়াটা আজ ১৫ হাত নালা লাফিয়ে পার হয়েছে। "

৫ ফুটের জায়গায় ১৫ হাত বলা সত্বেও নাগিব কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়। এটা কিভাবে সম্ভব?'

পড়া শেষ করেই ঝট করে সুমাইয়ার দিকে তাকাল সাইফ।

'কী বুঝলেন?'ওকে তাকাতে দেখেই প্রশ্ন করল সুমাইয়া।

'নাসের বিন ইউসুফের ধাঁধার সাথে অদ্ভুত মিল!'

'এগজ্যাক্টলি!'

সাইফ ধাঁধার নীচের দিকে চোখ বুলালো।

'ধাঁধার উত্তর আগামী সপ্তাহে দেয়া হবে। এতদিন ওয়েট করা সম্ভব না।'

'এখন তাহলে কী করবেন? আল আহরামের অফিসে যাবেন?'

'প্রয়োজনে তাই যাব, তবে এইমুহূর্তে অন্য একটা প্ল্যান আছে মাথায়।'

রহস্যময় হাসি হাসল সাইফ।

এগারো

লুইজিয়ানা, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা।

সাদা চোখে একতলা বাড়িটা একেবারেই সাদামাটা। কোনো বিশেষত্ব নেই, সাধারন। তবে সেটা ততক্ষন পর্যন্ত যতক্ষন না কেউ বাড়িটাতে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছে। কেউ বাড়িটাতে অনুপ্রবেশ করতে চাইলে সাথে সাথেই সে বুঝতে পারবে বাড়িটা আসলে দুর্গের মতই দুর্ভেদ্য। চারদিকে সাত ফুট উঁচু দেয়ালে ঘেরা। উপরে দেড় ফুটের ইলেক্ট্রিফায়েড ফেঞ্চ। বাউন্ডারির ভেতরে বিশালাকৃতির চার এলসেশিয়ান নিয়ে পাহারা দিচ্ছে চারজন গার্ড। গার্ডদের পরিচয় জানলে যে কেউ ভিমড়ি খাবে। এরা চারজনই আমেরিকান আর্মির ব্ল্যাক অপস কমান্ডো ইউনিটের সদস্য। দুর্ধর্ষ ট্রেনিং এদের করে তুলেছে রোবটের মত কর্মক্ষম এবং আবেগবর্জিত।

এই বাড়িটা তারা গত এক সপ্তাহ ধরে পাহারা দিয়ে চলেছে এক ভিআইপির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। ভিআইপির নাম, প্রফেসর আইজ্যাক কোহেন। দুনিয়ার হাতেগোনা কয়েকজন নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্টদের একজন।

প্রফেসর কোহেনের জন্ম, নিবাস ইসরাঈলে। ইসরাঈলের নেগেভ মরুভূমিতে অবস্থিত অত্যন্ত গোপন এক গবেষনাগারে এক বিশেষ রিসার্চ প্রজেক্টে গত দু' বছর ধরে ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করে আসছিলেন তিনি। শত গোপনীয়তার পরও প্রজেক্টটা শুরু হবার পর থেকেই কিভাবে যেন সুপার পাওয়ারগুলো এই রিসার্চের খবর জেনে যায়। বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি, তবে এই প্রজেক্টটা সফল হলে নিউক্লিয়ার সায়েন্সের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে সেটা সবাই আঁচ করতে পারে। ইসরাঈল হয়ে উঠবে পারমানবিক শক্তিতে অজেয়। তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় এই রিসার্চে সুপার পাওয়ারগুলোর উঁকি মারার

প্রতিযোগীতা। একাধিক স্যাবোটাজের ঘটনাও ঘটে। তবে শুরু থেকেই এই প্রজেক্টের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল মোসাদের হাতে। মোসাদের সাথে টেক্কা দিয়ে এই প্রজেক্টের ক্ষতি কিংবা হেঁশেল থেকে কিছু হাতাতে পারেনি স্যুপার পাওয়ারগুলো। উপরে উপরে যতই বন্ধুত্ব থাক, এই প্রজেক্ট যেকোনো মূল্যে হাত করা কিংবা নিদেনপক্ষে স্যাবটাজ করার ব্যাপারে সবচাইতে বেশি উৎসাহ আমেরিকারই ছিল। তবে পরিস্থিতি আচমকা এভাবে মোড় নেবে কেউ কল্পনাও করেনি।

ঘটনার শুরু দুই সপ্তাহ আগে।

এই প্রজেক্টটা ছিল তিন বছরের। নিরাপত্তার স্বার্থে এই তিন বছরে প্রজেক্টের প্রধান কয়েকজন রিসার্চারের জন্য পরিবারের সাথে দেখা করার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। শুধু তিন বছরের গোটা মেয়াদে বছরে একবার একদিনের জন্য পরিবারের সাথে দেখা করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, তাও সেটা মোসাদের কড়া পাহারায়। রিসার্চাররা খুশি মনেই রাজি হয়েছিলেন। না হবার কোনো কারণই নেই। যে পরিমাণ টাকা তাদের এই প্রজেক্টের জন্য দেয়া হবে তাতে করে পরের প্রজন্মও বসে খেতে পারবে। এছাড়াও তাদের পরিবারের নিরাপত্তা এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব সরকার নিয়ে নিয়েছিল। ভালই চলে গেল এভাবে দুবছর। আর মাত্র কয়েক মাস পরই প্রজেক্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তবে মেয়াদ শেষ হবার দু' এক মাস আগেই সফলতার সাথে প্রজেক্টটি সম্পন্ন করতে পারবেন বলে আশাবাদী প্রজেক্ট ডিরেক্টর প্রফেসর আইজ্যাক কোহেন।

শেষ বছরের ছুটি কাটাতে দু' সপ্তাহ আগে বাড়ি এসেছিলেন আইজ্যাক কোহেন। রিসার্চ সেন্টারের তুলনায় বাড়িতে স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা ব্যাবস্থায় একটু শিথিলতা ছিল। এরই সুযোগে ঘটে যায় এক অঘটন। অজ্ঞাত পরিচয় একটি কমান্ডো টিম অতর্কিত হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায় প্রফেসর আইজ্যাক কোহেনকে। অন্তত হামলাকারীরা তারা সেটাই বোঝাতে

চেয়েছিল। কিন্তু মোসাদ খোঁজ খবর নিতেই জানা গেল সব।

শুরু থেকেই আমেরিকার হয়ে কাজ করে আসছিলেন প্রফেসর কোহেন। বয়োজোষ্ঠ এই মানুষটি দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে আসছিলেন ইয়াসরাইলের বিভিন্ন টপ সিক্রেট সামরিক সায়েন্স প্রজেক্টে। অন্য যেকোনো সায়েন্টিস্ট এর চাইতে অনেক বেশি বিশ্বস্ত ছিলেন কোহেন। এই বিশ্বস্ততার সুযোগেই বিক্রি হয়ে যান তিনি। প্রজেক্টের কাজ শেষ পর্যায়ে চলে আসার সাথে সাথেই ছোবল বসান তিনি ইসরাঈলের ঘাড়ে। তবে এত সুযোগ সুবিধা পাবার পরও কেন এমন ভয়াবহ সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন সেটা জানতে পারেনি মোসাদ। তবে এটা যে কিডন্যাপ না বরং কোহেনের স্বেচ্ছা বেইমানী সেটা মোসাদ বুঝে ফেলে ঘটনার দিনই। কারণ যত হাইলি ট্রেইন্ড কমান্ডো ইউনিটই হোক না কেন, ভেতরের সাহায্য ছাড়া মোসাদের মত একটি সংস্থার বিরুদ্ধে এমন একটি অপারেশন পরিচালিত করা দুঃসাধ্য। কাজটা কাদের সেটা জানতেও বেগ পেতে হয়নি মোসাদের। তবে আমেরিকার সাথে যতই সুসম্পর্ক থাকুক না কেন, এক্ষেত্রে তার কোনটাই কাজে আসবে না। কুটনৈতিক পর্যায়ে ব্যাপারটা মীমাংসা করার কোনো সুযোগ নেই।

আমেরিকা আসবার পর কোহেনকে প্রথম এক সপ্তাহ রাখা হয়েছিল আর্মির একটি সুরক্ষিত বেস-এ। কিন্তু কোনো সিভিলিয়ানকে এভাবে সামরিক বেস-এ রাখার নিয়ম নেই। গত সপ্তাহে তাকে লুইজিয়ানার এই বাড়িটাতে পাঠানো হয়। চারজন কমান্ডো তাকে দিন রাত পাহারা দিয়ে চলেছে। বাড়িটার খুব কাছেই পুলিশ স্টেশন। যেকোনো পরিস্থিতিতে একটামাত্র বাটন প্রেস করলেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে জায়গাটা পুলিশে ছেয়ে যাবে।

এই মুহূর্তে আইজ্যাক কোহেন নিজের রুমে বসে আছেন। হাতে হুইস্কির গ্লাস। কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। কোহেন স্বাধীনচেতা মানুষ। সব সময়ই স্বপ্ন দেখে এসেছে নিজের ইচ্ছেমত রিসার্চ করবে। নিজের একটা ল্যাব থাকবে। কিন্তু নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করবার সাথে সাথেই

সরকার যেন তাকে জিম্মি করে ফেলল। একের পর এক সরকারি প্রজেক্টে কাজ করাতে একরকম বাধ্যই করে বসে। নিজের স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকল না। একটা প্রজেক্ট শেষ হবার পরই আরেকটা প্রজেক্টে মুখ গুঁজতে হত। তবে বিনিময়ে তিনি পেয়েছেনও কম না। অর্থ, খ্যাতি, যশ। কিন্তু একজন আপাদমস্তক বিজ্ঞানীর কাছে এসবের মূল্য নিতান্তই কম। আইজ্যাক কোহেনের বয়স বর্তমানে পঞ্চান্ন। পনেরো বছর ধরে তিনি এক রকম গোলাম হয়ে আছেন ইসরাঈলের কাছে। এই দুঃখ তিনি কখনই ভুলতে পারেননি। বছর তিনেক আগে একদিন বারে বসে মাতাল হয়ে এসব নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন স্বল্প পরিচিত এক বন্ধুর কাছে। জানতেন না, সেই লোকটা ছিল সিআইএ'র আন্ডার কাভার এজেন্ট।

দু সপ্তাহ পর যোগাযোগ করা হয় আইজ্যাক কোহেনের সাথে। প্রস্তাব দেয়া হয় আমেরিকার হয়ে কাজ করতে। বিনিময়ে তাকে দেয়া হবে নিরাপত্তা আর গবেষনার পূর্ন স্বাধীনতা। সেই সাথে এখন যা পাচ্ছেন সেটা তো পাবেনই। কিছু নয়া ভেবেই মানা করে দেন তিনি।

এর কয়েকদিন পর তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন তাকে একটা ল্যাব দিতে। উপযুক্ত সাহায্য এবং স্বাধীনতা পেলে তিনি নিউক্লিয়ার সায়েন্সের গতিপথ বদলে দেবেন। কিন্তু সরকার তার প্রজেক্ট ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের প্রজেক্ট বানিয়ে ফেলে সেটাকে। তাকে ডিরেক্টর করে পাঠিয়ে দেয় মরুভূমিতে। তিনি এমনটা চাননি কখনও। চেয়েছেন নিজের মত করে রিসার্চ করতে। কিন্তু সেটা হয়নি। প্রতি মুহূর্তে সরকার তার কাজে নাক গলিয়েছে।

প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজতে থাকেন তিনি। প্রথম বছরের ছুটি কাটাতে নিজ বাড়িতে এসেই তিনি যোগাযোগ করেন সিআইএর সাথে।

কিন্তু সিআইএ তাকে পরামর্শ দেয়, এই প্রজেক্টের নাড়ি নক্ষত্র সাথে নিয়েই যেন তিনি আমেরিকায় পাড়ি জমান। তাতে করে সব কিছু নতুন করে শুরু করার

ঝামেলা পোহাতে হবে না কাউকেই।

এরপর কোহেনকে সন্দেহ মুক্ত রাখবার জন্যই স্যাবটাজ অব্যাহত রাখে সিআইএ।

আমেরিকা পালিয়ে আসার আগে প্রজেক্টের সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট করে দিয়ে এসেছেন প্রফেসর আইজ্যাক কোহেন। এমনভাবে নষ্ট করেছেন, টের পেতেই অন্যান্য রিসার্চারদের কয়েকদিন লেগে যাবে। আসল ডকুমেন্টসহ আইজ্যাক কোহেন তখন আমেরিকায়।

আজ কোনো আক্ষেপ নেই কোহেনের। শুধু দুঃখ স্ত্রীকে আর দেখা হবে না কখনও। তবে সেজন্য একবারে আহামরি কোনো কষ্টও হচ্ছে না তার। তার স্ত্রী এমনিতেই বুড়ি হয়ে গেছে। কোনো সন্তানও তাকে দিতে পারেনি। এখানে একটু সেটেল হলেই নতুন করে জীবন শুরু করবার চিন্তা ভাবনা তার। সবমিলিয়ে চিন্তার কোনো কারন না থাকলেও নিজের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি খানিক চিন্তিত। যে নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে তাতে করে ভয়টা উড়িয়ে দেয়া চলে। কিন্তু কেন যেন উড়িয়ে দিতে পারছেন না। মোসাদ ছেড়ে কথা কইবে না তাকে।

হাতের হুইস্কির গ্লাস নিয়ে জানালার কাছে চলে এলেন তিনি। এই বাড়ির আশেপাশে অনেকদুর পর্যন্ত কোনো বহুতল ভবন নেই। স্নাইপার নিয়ে কেউ ওত পেতে থাকবে এমন কোনো সম্ভবনা নেই। বাড়িটার চারপাশ উজ্জল ফ্লাড লাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। আঙ্গিনায় কোনো ঝোপঝাড় নেই। মরুভূমির মত ফাঁকা। বাড়ির চারপাশেই চারজন কমান্ডো পুরো দস্তুর সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে হাতে এমসিক্সটিন নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। পাশে পাশে হাঁটছে ভয়ংকর দর্শন একটা করে এলসেশিয়ান। সন্ধ্যার পর থেকেই টহল শুরু হয়। দিনে দুজন দুজন করে পালা করে ঘুমিয়ে নেয় গার্ডরা। সারারাত চিতার মত নিঃশব্দে পুরো বাড়ি ঘিরে চক্কর দিতে থাকে ওরা।

দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন তিনি। দরজায় উঁকি দিয়েছে জেফরি। জেফরি জনসন। ছেলেটাকে বেশ পছন্দ হয়ে গেছে আইজ্যাক কোহেনের। এখানকার সিকিউরিটি ইনচার্জ। সিআইএর এজেন্ট। বয়স পয়ত্রিশের মত। জেফরি সাধারণত বাড়ির ভেতরেই থাকে। এখান থেকেই পুরো বাড়িটার সিকিউরিটি কন্ট্রোল করে সে। সে ছাড়াও বাড়িতে আরো একজন ওদের রান্নার জন্য রয়েছে। এই লোকটাও আমেরিকান আর্মির একজন সোলজার। প্রতিকূল পরিবেশে জেফরি আর এই লোকটাও বড় ভূমিকা রাখতে পারবে। অর্থাৎ বাড়ির ভেতর এবং বাইরে মোট দুই স্তরে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে জানালার কাছ থেকে সরে এলেন তিনি। উহু, মোসাদ এখানে সুবিধে করতে পারবে না। নিরাপত্তা নিচ্ছিদ্র।

‘কী খবর, জেফরি?’

‘স্যার, একটু প্রবলেম।’ ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল জেফরি।

ভ্রু কুঁচকে গেল প্রফেসর কোহেনের। কেন সেটা অবশ্য বুঝতে পারলেন না তিনি। জেফরির কথা শুনে নাকি অন্য কোনো কারণে? মনটা খচখচ করতে লাগল।

‘কী হয়েছে?’ প্রশ্ন করলেন তিনি।

‘স্যার, আজ বিকেলে যখন রুটিন চেকের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম, তখন একটা ব্যাপারে একটু খটকা লেগেছে আমার।’

প্রফেসর কোহেন জানেন, প্রতিদিন বিকেলে জেফরি বাইরে বের হয়। প্রয়োজনীয় কিছু কেনার থাকলে কিনে আনে আর বাইরের পরিস্থিতি রেকি করে আসে। বিপদ এলে বাইরে থেকেই আসবে।

প্রফেসর কোনো প্রশ্ন করবার আগে জেফরি নিজেই বলে যেতে লাগল,

‘আপনার জন্য বই কিনতে শপিংমলে যাবার সময় আমাদের বাড়িটা থেকে এক ব্লক দূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আসার সময়ও সেই গাড়িটাকে দেখেছি।’

হো হো করে হেসে উঠলেন আইজ্যাক কোহেন। তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ভোলেননি।

‘সিআইএ-তে থাকতে থাকতে তোমাদের সবার সন্দেহবাতিক রোগ হয়েছে। একটা গাড়ি দেখেই ভাবছ ওরা আমাকে মারার জন্য লোক পাঠিয়েছে? হা হা হা!’ হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছেন আইজ্যাক কোহেন।

হাসতে হাসতেই এক সময় আচমকা জমে গেলেন তিনি। এতক্ষন ধরে খচখচ করতে থাকা প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন। জেফরি রুমে ঢোকার পর থেকেই তার বারবার মনে হচ্ছিল কোথাও একটা ঘাপলা আছে। এইমাত্র বুঝতে পারলেন সেটা। জেফরির উচ্চতা! জেফরি লম্বা মানুষ। ঝাড়া ছয়ফুট। কিন্তু আজ কেমন যেন খাটো খাটো মনে হচ্ছিল। তাছাড়া গলার আওয়াজটাও যেন কেমন।

জেফরি কথা বলতে বলতে আইজ্যাক কোহেনের পেছনে চলে গিয়েছিল। কথাটা মনে হতেই পেছন ফিরে তাকাতে গেলেন তিনি। সুযোগ পেলেন না। একটা পিয়ানোর সরু তার কোহেনের গলা পেঁচিয়ে ধরল। বাধা দেবার আগেই কেটে বসে যেতে লাগল।

এই অস্ত্রটা অত্যন্ত প্রিয় আততায়ীর। একটুকরো সরু তার, দু পাশে দুটো রিং লাগানো। নিঃশব্দে একজন মানুষকে মেরে ফেলতে এর জুড়ি নেই। গলা আক্ষরিক অর্থেই দুভাগ করে দেয়া সম্ভব। তবে ছুড়ির মত বীভৎসতা নেই এতে। মাখনের গায়ে যেভাবে ছুড়ি বসে যায় ঠিক সেভাবে মানুষের গলায় বসে যায় সুক্ষ তারটা। ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করে আততায়ী, আর যাইহোক, নাম তার জেফরি নয়। জেফরি এইমূহুর্তে অর্ধেক কাটা গলা নিয়ে শুয়ে আছে

এক ব্লক দূরে রাখা একটা গাড়ির বুটে।

আততায়ী গত এক সপ্তাহ ধরেই গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করে যাচ্ছিল এই বাড়ির মানুষদের প্রতিটা মুভমেন্ট। একব্লক দূরে একটা গাড়িতে বসে যতটা পারা সম্ভব আরকি। লক্ষ্য করেছে, প্রতিদিন বিকেলে ওই বাড়ি থেকে এক লোক বাইরে বের হয়। গতকালই মাত্র জানতে পেরেছে লোকটা এই বাড়ির সিকিউরিটি ইনচার্জ। আততায়ী কখনও এক গাড়ি এবং এক স্থান দুবার ব্যাবহার না করায় জেফরির দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি।

এই এক সপ্তাহে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে জেফরির প্রচুর ছবি তুলেছে আততায়ী। তারপর সেগুলোর সাহায্যে রাবারের মুখোশ তৈরি করেছে। রাবারের মুখোশ জিনিসটা অত বেশি কাজের না। শুধু চেহারাটাই ঢাকা যায় গোঁজামিল দিয়ে। তাও কাছ থেকে দেখলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভবনা থাকে। এছাড়াও দেহাকৃতি, কন্ঠস্বর কিছুই লুকনো যায় না। বাড়িতে প্রবেশের সময় যদিও বিশেষ ধরনের জুতো পড়ে উচ্চতা সমস্যার সমাধান করেছিল আততায়ী, কিন্তু কোহেনের রুমে খালি পায়ে ঢুকতে হওয়ায় একটু দ্বিধা কাজ করছিল আততায়ীর মনে। তবে আইজ্যাক কোহেন আর যাইহোক, গোয়েন্দা নয়। টের পায়নি কিছু। অবশ্য শেষ মুহূর্তে বোধহয় কিছু আঁচ করতে পেরেছিল সে।

এইমাত্র শেষ একটা ঝাঁকি দিয়ে নিথর হয়ে গেলেন প্রফেসর আইজ্যাক কোহেন।

আততায়ী দেহটাকে একটা কাউচের আড়ালে রেখে বেরিয়ে এল রুম থেকে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে গেল বাড়ির মূল গেটের দিকে। বাড়ির সামনের অংশটা যে পাহারা দেয় তার উপরই গেটের দায়িত্ব। রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে গেটটা খোলা হয়।

অস্ত্রের মধ্যে জেফরির পকেট থেকে একটা গ্লক পিস্তল পেয়েছে শুধু আততায়ী। এটা দিয়ে যদি চার ব্ল্যাক অপস কমান্ডোর মোকাবেলার প্রয়োজন পড়ে তাহলে কোনো আশাই নেই আততায়ীর। সেজন্য আফসোস থাকবে না তার। নিজের

মিশন সফলভাবে শেষ করতে পেরেছে এটাই বড় কথা।

সদর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে আততায়ী। উচ্চতা সমস্যা আবারও বিশেষ জুতোটা পরে চাপা দিতে পেরেছে, তবে কথা বলতে হলে ধরা পড়ে যেতে পারে। আইজ্যাককে ফাঁকি দেয়া গেলেও একজন কমান্ডোকে ফাঁকি দেয়া সোজা কথা নয়।

আততায়ীকে গেটের কাছে আসতে দেখেই খটাশ করে স্যালুট ঠুকল কমান্ডো।

কথা না বলে ইশারায় তাকে গেট খুলতে বলল আততায়ী।

চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল কমান্ডো। এই সময় জেফরি কখনই বাইর যায় না।

'কেন, স্যার।' সুপিরিয়র হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে জেফরিকে এ প্রশ্ন করার অধিকার কমান্ডোর আছে।

চিন্তায় পড়ে গেল আততায়ী। এখন কথা বলতেই হবে। হঠাৎ কাশতে শুরু করল আততায়ী। কন্ঠস্বরের পার্থক্য যেন কিছুটা হলেও যৌক্তিক মনে হয় কমান্ডোর কাছে। ঠিক এমন সময় একটা ঘটনাটা ঘটে গেল।

বাড়ির ভেতর থেকে বাবুর্চির জোর গলার চিৎকার ভেসে এল, 'প্রফেসর ইজ ডেড!'

আততায়ী একটা গুরুত্বপূর্ন তথ্য জানতে পারেনি। এসময়টা কোহেনের ডিনারের সময় ছিল। ডিনার নিয়ে রুমে প্রবেশ করেই ব্যাপারটা টের পায় বাবুর্চি।

ঝট করে আততায়ীর দিকে তাকাল কমান্ডো। হাতের এমসিক্সটিন তাক করতে গেল। একই সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল আততায়ীর দেহেও। এমসিক্সটিনের নল একপাশে সরিয়ে দিয়েই লোকটার তলপেট লক্ষ্য করে লাথি কষল। লাথিটা যেন গিয়ে কংক্রীটের দেয়ালে লাগল। পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারল আততায়ী। লোকটা বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে আছে! শুধু পেটেই নয়, কাধের

উপরিভাগ বাদে দেহের বেশিরভাগ জায়গাতেই প্রটেকশন আছে কমান্ডোর। এদিকে সে নিজে শুধু স্যুট পরে আছে!

তলপেটে চিলিক দিয়ে উঠল আততায়ীর। লড়াইটা সহজ হবে না।

কমান্ডোর এলসেশিয়ানটা গার্ডরুমের সাথে বাঁধা। প্রবল প্রতাপে তর্জন গর্জন করে চললেও ওদিক থেকে আপাতত ভয় নেই। কমান্ডোকে দ্রুত সামলাতে হবে।

হ্যান্ড টু হ্যান্ড কমব্যাটে হাতের এমসিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেলটা ঝামেলা বাড়াবে বুঝতে পেরে অস্ত্রটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সাথে সাথেই আততায়ীর হাঁটু লক্ষ্য করে সজোরে পা চালাল কমান্ডো। জায়গামত লাগলে হাটুর জয়েন্ট থেকে পা' টা দু'ভাগ হয়ে যেত। কিন্তু আততায়ী বিদ্যুৎ গতিতে পা উপরে উঠিয়ে আঘাতটা পায়ের পাশের মাংসপেশীতে নিল। তাতেই মনে হল পা'টা প্যারালাইজড হয়ে পড়েছে। নিজেকে সামলে নেবার আগেই আততায়ী লক্ষ্য করল পায়ের গোড়ালি থেকে একটা ছোট থ্রোয়িং নাইফ বের করে ফেলেছে কমান্ডো। তবে বোঝাই যাচ্ছে এটাকে "থ্রো" করার ইচ্ছা আপাতত নেই তার। সেটা প্রমান করতেই যেন কমান্ডো ছুরিটা আততায়ীর গলা লক্ষ্য করে চালাল। পেছনে হেলে আঘাতটা পুরোপুরি ব্যার্থ করে দিল আততায়ী। নাকের মাত্র কয়েক ইঞ্চি উপর দিয়ে বাতাস কেটে গেল ছুরিটা।

কুকুরটা ভয়ানক স্বরে গর্জে চলেছে। সেই আওয়াজে অথবা বাবুর্চির চিৎকারে বাকি তিন কমান্ডো বাড়ির তিন পাশ থেকে ছুটে এল। ওদেরকে লড়তে দেখে দুজন এদিকে আর অপরজন বাড়ির ভেতর প্রফেসরের অবস্থা জানার জন্য গেল। কমান্ডো দুজন এখনও কিছুটা দূরে। হাতের অস্ত্র বাগিয়ে ধরে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। তবে সঙ্গীর গায়ে লেগে যাবার ভয়ে গুলী ছুড়ছে না। কমান্ডো দুজন আরও কাছে আসার আগেই যা করবার করতে হবে আততায়ীকে। গ্লকটা বের করার কোনো সুযোগই পাবে না সে।

কমান্ডো দ্বিতীয়বারের মত ছুরি চালাতে গেল তাকে লক্ষ্য করে। তার আগেই চিতার মত লাফ দিল আততায়ী।

আগেই খেয়াল করে দেখেছে কমান্ডো বাঁহাতি। ছুড়িটা উল্টো করে ধরে ডান থেকে বামে চালায়। সে লাফ দিয়েছে কমান্ডোর ডানপাশ লক্ষ্য করে। শূন্যে থাকা অবস্থায়ই ভোজবাজির মত আততায়ীর হাতে সেই সরু তারটা বেরিয়ে এল। সময়ের নিখুঁত হিসেবে হাতটা বাতাস কেটে ডান থেকে বামে চলে যাবার মাঝপথে কমান্ডোর বাড়ানো হাতে এক ঝটকায় তারটা জড়িয়ে ফেলল আততায়ী। হ্যাঁচকা টান দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা প্রায় দুভাগ হয়ে গেল কব্জি থেকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। শিরা কেটে যাওয়ায় কিছুক্ষন পর সব রক্ত হারিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে কমান্ডো। তবে কমান্ডোদের ট্রেনিং দেয়াই হয় মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত হাল না ছাড়ার। ভালমতই জানা আছে আততায়ীর। কারন সে নিজেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমান্ডোদের মধ্যে একজন!

সেজন্যই কোনো সুযোগ দিল না আততায়ী। কাটা পড়া হাত দেখে সংবিৎ হারিয়ে ফেলেছিল কমান্ডো। সেই সুযোগে তারটা ছেড়ে দিয়ে কমান্ডো পেছনে চলে এল সে। ঘাড় ধরে ভয়ংকর এক মোচড় দিল। কট আওয়াজ করে ঘাড়টা ভেঙ্গে গেল কমান্ডোর। সাথে সাথেই মৃত্যু। তবে লাশটা ছাড়ল না সে। গায়ের সাথে চেপে ধরে রাখল। যার সুফল পাওয়া গেল কয়েক সেকেন্ড পরই।

লড়াইয়ের ফলাফল পরিষ্কার হয়ে যেতেই বাকি দুই কমান্ডো হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিল। তাদের সঙ্গী আততায়ীর হাতে মারা পড়তেই ফায়ার ওপেন করল। এমসিক্সটিন অ্যাসল্ট রাইফেলের মুহুর্মুহু গর্জনে কেঁপে উঠল প্রাঙ্গন।

কমান্ডোর লাশের আড়ালে থাকায় আততায়ী বেঁচে গেল। সমস্ত বুলেট এসে আঘাত করল মৃত কমান্ডোর গায়ে। স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যাসল্ট রাইফেলের বুলেট কমান্ডোর দেহ ভেদ করে আততায়ীকে খুন করতে পারত, কিন্তু

বুলেটপ্রুফ ভেস্ট ঠেকিয়ে দিল তপ্ত বুলেটগুলোকে। মাথা নীচু করে কমান্ডোর পেছনে গুটিশুটি মেরে রইল আততায়ী।

এক সময় আচমকা থেমে গেল গুলীর আওয়াজ। বুলেট শেষ হয়ে গেছে ওদের। রিলোড করতে কিছুটা সময় লাগবে। হাতে কয়েক সেকেন্ড সময় পেতেই দেরী না করে কোমর থেকে গ্লক বের করে গুলী ছুঁড়ল আততায়ী।

বাড়ির প্রাঙ্গনে তেমন কোনো কাভার নেয়ার জায়গা নেই। খোলা জায়গাতে বসেই আক্রমন করেছে কমান্ডোরা। আততায়ী অনেকটা না দেখে গুলী ছুড়লেও প্রথমজনকে ঘায়েল করল একটা বুলেট। সোজা কপালে গিয়ে লাগল। বাকি কমান্ডো সাথে সাথেই ঝাপ দিয়ে কাভার নিল একটা পাথুরে বেঞ্চের আড়ালে। এমসিক্সটিন রিলোড হয়নি। তার অপেক্ষাও করল না সে। হোলস্টার থেকে নিজের গ্লক বের করে দুটো গুলী পাঠিয়ে দিল আততায়ীর দিকে। তাড়াহুড়ো করায় দুটোই বেশ দূর দিয়ে পাশ কাটাল আততায়ীর।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আততায়ী, বিপদ অনেকটাই কেটে গেছে, আর মাত্র একজন শত্রু আছে। তবে বলা যায় না, যেকোনো মুহূর্তে বাড়ির ভেতর থেকে বাকি দুজন বেরিয়ে আসতে পারে। তার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে গেট পেরিয়ে। গেট খোলার জন্য মৃত কমান্ডোর পকেট হাতড়াতে লাগল রিমোটের খোঁজে। সেই সাথে লাশটা টেনে হিঁচড়ে পিছিয়ে যেতে লাগল গেটের দিকে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

আরও কয়েক সেকেন্ড পর রিমোটটা খুঁজে পেল সে। গেটটা এখনও কয়েক গজ দূরে। কমান্ডোর ভারী শরীর টেনে নিয়ে যেতে সময় নষ্ট হচ্ছে। তবুও কিছু করার নেই, এই মুহূর্তে এই লাশটাই তার রক্ষা কবচ।

গেট যখন আর মাত্র দু' ফুট দূরে, ঠিক তখন বিপদটা এল দু' দিক থেকে।

রিলোড হয়ে গেছে, কাভারে থেকেই ফায়ার ওপেন করল কমান্ডো। আবারও মাথা নীচু করে শরীর লুকাতে বাধ্য হল আততায়ী।

এবার কমান্ডো থেমে থেমে হিসেব করে গুলী করছে। আততায়ীকে আটকে রেখে সময় পেতে চাইছে, যাতে করে ওর বাকি দুই সঙ্গী বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

হাতের গ্লকে আর মাত্র দুটো বুলেট আছে আর মৃত কমান্ডোর হোলস্টারে ফুললি লোডেড আরেকটা গ্লক, সাথে একটা স্পেয়ার ম্যাগাজিন। সব মিলিয়ে মাত্র চোদ্দটা বুলেট নিয়ে তিনজন দক্ষ শত্রুর মোকাবেলা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে তার জন্য।

এমন সময় বিপদের ষোলকলা পূর্ণ করে সাইরেনের আওয়াজ কানে এল আততায়ীর। পুলিশ চলে এসেছে!

বারো

‘কী প্ল্যান?’ ভ্রু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল স্যুমাইয়া।

‘দুটো ধাঁধাতেই একটা কমন ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন?’ পালটা প্রশ্ন করল সাইফ।

‘হুম, ঘোড়া আর হাত।’

‘ব্যাপারটা আপনার কাছে অদ্ভুত লাগছে না?’

‘না তো, কী অদ্ভুত লাগবে?’

‘আমরা সাধারণত কিসে মাপি? হয় ফুট কিংবা মিটারে। অথচ দুটো ধাঁধাতেই হাতের উল্লেখ রয়েছে।’

‘তাই তো!’

‘তারমানে, সমস্ত জবাব রয়েছে এই ঘোড়া আর হাতে।’ বলতে বলতে পকেট থেকে সেলফোন বের করে ফেলল সাইফ। ব্রাউজার ওপেন করে সার্চ করল “horse + hand” লিখে। শুরুতেই উঁইকিপিডিয়ার একটা পেজ এল। পড়তে শুরু করল সাইফ।

ভ্রু কুঁচকে বেশ কিছুক্ষন ধরে তাকিয়ে রয়েছে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে। ওদিকে স্যুমাইয়া আর সালাহউদ্দিন উশখুশ করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে স্যুমাইয়া বলে উঠল, ‘কিছু পেলেন?’

জবাব না দিয়ে স্ক্রিন থেকে মুখ তুলল সাইফ। মুখে প্রশান্তির হাসি। বলল, ‘এত সহজ ব্যাপারটা আগে মাথায় এল না কেন ভাবতেই লজ্জা লাগছে। তবে আগে তো আর জানতাম না সমস্ত রহস্য রয়েছে এই “ঘোড়ার হাতে”!’

সাইফের হেঁয়ালিতে আরও অধৈর্য হয়ে গেল সুমাইয়া।

‘কী হয়েছে?’

‘ঘোড়ার ব্যাপারে মজার একটা তথ্য জানতে পারলাম। আমরা সাধারণত সব জিনিস ফুট, মিটারে হিসেবে করলেও ঘোড়ার হিসেব কিন্তু ভিন্ন। অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড এর মত কিছু দেশে এখনও ঘোড়ার উচ্চতাসহ ঘোড়া সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় মাপা হয় হাতের হিসেবে!’

‘কী?’ হতভম্ব হয়ে গেছে সুমাইয়া আর শেইখ সালাহউদ্দিন?

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সাইফ।

‘কিন্তু সমস্যা তো সেক্ষেত্রে বেড়ে যাচ্ছে?’ বলল সুমাইয়া।

‘কিভাবে?’

‘সাধারনত এক হাত, অর্থাৎ হাতের আঙ্গুল থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত হয় হল গিয়ে আঠারো ইঞ্চি। তাহলে পাঁচ ফুটের নালা কিভাবে পনেরো হাত হবে?’

হাসল সাইফ, ‘আসল মজার ব্যাপারটা তো আপনাদের এখনও বলিইনি।’

‘আসল মজা?’

‘হুম, হাত বলতে আপনি যা বললেন, এই হাতের মাপ তেমন নয়। এই পদ্ধতিতে প্রতি চার ইঞ্চিতে এক হাত ধরা হয়!’

‘চার ইঞ্চিতে এক হাত!’ হতবাক হয়ে গেল সুমাইয়া। ‘অর্থাৎ, নাগিব পাঁচ ফুটের নালাকে পনেরো হাত বললেও মিথ্যাবাদী হবে না। হিসেবটা ঠিকই থাকছে।’

‘এগজ্যাক্টলি।’

‘নাসের চাচার ধাঁধাটা ছিল, “একটা ঘোড়া একলাফে পনেরো হাত যেতে

পারলে দুই লাফে কতদূর যেতে পারে? তুমিও এগিয়ে যাও অতটা।”

দুই লাফে হচ্ছে ত্রিশ হাত। অর্থাৎ, একশ বিশ ইঞ্চি। তারমানে ধাঁধার উত্তরটা হল, কফিন থেকে দশ ফুট সামনে এগিয়ে যেতে হবে!’ বাচ্চা মেয়ের মত উত্তেজিত গলায় বলল স্মুমাইয়া।

‘বুলস আই!’ স্মুমাইয়ার উত্তেজনা দেখতে ভালই লাগছে সাইফের।

‘এই পদ্ধতি আমাদের এখানে প্রচলিত না সম্ভবত। নয়ত আরও আগেই উত্তরটা জানা যেত।’ এবার বলে উঠলেন শেইখ সালাহউদ্দিন।

‘এখন হয়ত প্রচলিত না, কিন্তু পদ্ধতিটার উৎপত্তি কিন্তু এই মিশরেই!’

‘তাই নাকি?’

‘হ্যাঁ, প্রাচীন মিশরে এভাবেই পরিমাপ করা হত। এই দেখুন উইকিপিডিয়াতে বিস্তারিত লেখা রয়েছে।’ ফোনটা বাড়িয়ে দিল সাইফ।

স্মুমাইয়া হাতে নিয়ে দেখল লেখা রয়েছে:

The hand is a non- SI unit of measurement of length equal to exactly 4 inches (101.6 mm).It is now normally used only for the measurement of the height of horses in some English-speaking countries, including Australia, Canada, the United Kingdom and the United States .With origins in ancient Egypt, it was originally based on the breadth of a human hand. The adoption of the international inch in 1959 allowed for a standardized imperial form and a metric conversion. It may be abbreviated to "h" or "hh".

‘অবশেষে।’ লেখাটা পড়ে হুহ করে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্মুমাইয়া। সালাহউদ্দিনের মুখেও হাসির রেখা দেখতে পেল সাইফ।

‘নেক্সট প্ল্যান তাহলে কী?’ শেইখ সালাহউদ্দিন জানতে চাইলেন।

‘ধাঁধার সমাধান যেহেতু হয়েই গেছে, আজ রাতে আবার পিরামিডে গিয়ে ট্রেজার দেখে আসব। পেলে কাল থেকে এগুলো এ দেশ থেকে বের করে নেবার মিশন শুরু করতে হবে।’ বলতে বলতেই সাইফ লক্ষ্য করল সুমাইয়া বাবার দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে কী যেন কথা বলে নিল। ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে কিছু একটা বলতে চায়।

‘কিছু বলবেন?’ জানতে চাইল সাইফ।

‘আজ রাতে আমাকে আপনার সাথে নিয়ে যাবেন?’

চুপ করে রইল সাইফ।

‘আপনার সমস্যা হলে থাক।’ মন খারাপ করে ফেলল মেয়েটা।

কী ভেবে যেন রাজি হয়ে গেল সাইফ।

‘ওকে, তৈরি থাকবেন সন্ধ্যায়।’

* * *

সন্ধ্যায় হোটেল থেকে বের হবার পর থেকেই সুমাইয়া লক্ষ্য করেছে সাইফ ঘন ঘন তাকাচ্ছে রিয়ারভিউ মিররের দিকে। মুখের ভাব দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। যেন পাথর কুঁদে বানানো একটা ভাস্কর্য গাড়ি চালাচ্ছে। এক পর্যায়ে অস্থিরতা চেপে রাখতে ব্যর্থ হল সুমাইয়া।

‘বারবার রিয়ারভিউ মিররে কী দেখছেন?’

‘আমাদের ফলো করা হচ্ছে।’ নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল সাইফ। ফলো করা হচ্ছে শুনে যতটা না তার চাইতে বেশি সাইফের নির্লিপ্ততা দেখে অবাক হল সুমাইয়া।

‘তারমানে এখন আমরা মরুভূমিতে যেতে পারছি না, তাই তো?’

‘সেটা কখন বললাম?’

‘পেছনে লেজ নিয়ে যাবেন?’

কথা না বলে মুচকি হাসল সাইফ। স্মমাইয়ার দেখে অবশ্য নিষ্ঠুরই মনে হলে হল হাসিটা!

ঘ্যাঁচ করে একটা রেস্টুরেন্টের সামনে ব্রেক কষল সাইফ। চোখ কপালে তুলে ওর দিকে তাকাল স্মমাইয়া।

‘আপনি কি এখন খাবেন?’

‘মিশরের রেস্টুরেন্টে কি খাওয়া ছাড়া অন্য কাজও করা যায়? জানতাম না তো!’

‘আপনি গিয়ে খেয়ে আস্মন, আমার গলা দিয়ে নামবে না কিছু।’

‘নামাতে হবে। এমন ভাব করুন যেন আমরা সদ্য প্রেমে পড়া যুগল ডেট করতে এসেছি!’ সাইফ নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। এগিয়ে এসে খুলে দিল স্মমাইয়ার দরজা। চোখে মুখে প্রবল বিস্ময় নিয়ে গাড়ি থেকে নামল মেয়েটা। সাইফ ওর হাত ধরল কোমলভাবে। নিয়ে চলল রেস্টুরেন্টের দিকে। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে স্মমিয়ার ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেছে!

সাইফ ভেতরে ঢুকতেই একজন ওয়েটার এসে এমনভাবে স্বাগত জানাল যেন সাইফের সাথে তার জনম জনমের পরিচয়। কোণার দিকের একটা টেবিলে নিয়ে গেল ওদের। এখান থেকে খুব স্মন্দরভাবে দরজা নজরে আসে এবং তারচাইতেও স্মন্দরভাবে দেখা গেল ওদের ফলো করা গাড়িটাও পার্কিং লটে এসে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে দু’ জন মানুষের ছায়া ছায়া অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। তবে নামল না কেউ গাড়িটা থেকে। নিজেদের চেহারা আড়াল করে নজর রাখছে।

ধীরে সুস্থে ডিনার শুরু করল ওরা। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগিয়ে এটা ওটা চাখল সাইফ। যেন এ দুনিয়ায় ওর আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য মিশরীয় রন্ধনপ্রণালীর স্বাদ আস্বাদন করা। সামনে বসা সুমাইয়ার উৎকণ্ঠা যেন ওর নজরেই আসছে না। ওদিকে বাইরে বসে থাকা লেজুড়দুটো ধৈর্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে। শুধু পারছে না ভেতরে এসে সাইফের ঘাড় ধরে আবার গাড়িতে ওঠাতে!

'আচ্ছা, বলতে পারেন, ডেজার্টে কোন জিনিসটা খেতে অমৃতের মত লাগে?' মুখে চকলেট ফ্লেভার আইসক্রিম নিয়ে প্রশ্ন করল সাইফ।

এবার আর বিরক্তি লুকোনোর কোনো চেষ্টাই করল না সুমাইয়া। 'আপনার যদি আমাকে নিয়ে পিরামিডে যেতে আপত্তি থাকে তখন বললেই পারতেন, এখানে এসে...' কথা শেষ করতে পারল না সুমাইয়া। সাইফের মুখভঙ্গি আচমকা বদলে গেছে। সেই পুরনো পাথুরে চেহারায় ফিরে গেছে। খপ করে ওর হাত ধরেই টেনে নিয়ে চলল রেস্টুরেন্টের পেছন দিকে। সুমাইয়া যেতে যেতে একবার পেছন ফিরে দেখল দশ বারোজন টুরিস্টদের একটা দল রেস্টুরেন্টে ঢুকছে। দরজাটা সাময়িক সময়ের জন্য আড়ালে চলে গেছে ছোটখাট জনস্রোতে।

আরো কিছু বুঝে ওঠার আগেই সুমাইয়া নিজেকে রেস্টুরেন্টের পেছনের রাস্তায় আবিষ্কার করল। ওর হাত ধরে হন হন করে হেঁটে চলেছে সাইফ। প্রায় দশ মিনিট হাঁটবার পর একটা কালো মিশমিশে গাড়ির কাছে এসে থামল। দরজা খুলে ইশারায় উঠতে বলল সাইফ ওকে।

গাড়িতে বসে মুখ খুলল সুমাইয়া। 'এই রেস্টুরেন্ট, গাড়ি...?'

'প্রি প্ল্যানড। মোসাদকে ঠাণ্ডা মেরে যেতে দেখেই ধারণা করেছিলাম ওরা মতলবে আছে। আমাদের উপর সরাসরি হামলা না করে প্রতিটা মুহূর্ত নজরে রেখে পৌঁছতে চাইছে ট্রেজারের কাছে। সময়মত অতর্কিতে হামলা চালিয়ে

ছিনিয়ে নেবে ট্রেজার। কিন্তু এমন আনাড়ি লোকজনকে আমার পেছনে লাগিয়েছে দেখে রীতিমত অপমানিতবোধ করছি!' গাড়ি ছেড়ে সাঁ করে মূল রাস্তায় বেরিয়ে এল সাইফ। ছুটে চলল পিরামিডের দিকে।

* * *

ভগ্ন প্রায় পিরামিডের একেবারে সামনে এসেও স্থমাইয়া বুঝতে পারেনি এটা একটা পিরমিড। সাইফ বুঝিয়ে না দিলে আরো খানিকটা সময় লাগত বুঝে উঠতে।

'ওহ মাই গড! এটাই সেই পিরামিড?'

মাথা ঝাঁকাল সাইফ। আধো অন্ধকারে স্থমাইয়ার চোখে পড়ল কিনা দেখার প্রয়োজনবোধ করল না সাইফ। নেমে পড়ল মাটির নিচের চেম্বারে। হাত বাড়িয়ে সাবধানে স্থমাইয়াকেও নামিয়ে আনল।

গা শিরিশির করে উঠল স্থমাইয়ার। এবারই প্রথম পিরামিডে আসেনি ও। কিন্ত একগাদা টুরিস্ট আর গাইডের সাথে পিরামিডে ঘুরে বেড়ানোর সাথে আজকের রাতের অভিজ্ঞতার তফাৎটা অনেক। ভাবতেই অবাক লাগছে, নির্মাণের পর মাত্র দু' জন মানুষের পা পড়েছে এই জায়গাটাতে!

ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল সাইফ। লুকনো লিভার চেপে দরজা খুলল। অল্প সময়ের মধ্যেই চলে এল মূল চেম্বারে। মাঝের কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নাসের বিন ইউস্থফের নির্দেশিকাটা বের করে চোখ বোলাল। ত্রিশ হাত অর্থাৎ দশ ফুট এগোতে হবে ওদের এখন। সাইফ দশ ফুট মেপে আগেই একটা স্থতো কেটে রেখেছিল। ওটা বের করে একপ্রান্ত স্থমাইয়ার হাতে ধরিয়ে দিল, ওকে কফিনের পাশে দাঁড়াতে বলে অপর প্রান্ত নিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। দশ ফুট দূরে এসে থামল। ওর মনে ক্ষীণ আশা ছিল সঠিক জায়গায় দাঁড়ালে চাপ লেগে হয়ত কোনো দরজা-টরজা খুলে যাবে। কিন্তু এমন কিছুই ঘটল না।

‘এবার কী?’ সুমাইয়ার গলায় চাপা হতাশা।

সাইফ জবাব না দিয়ে হাতের ফ্ল্যাশ লাইটটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো চেম্বারটা দেখতে লাগল। সঠিক জায়গায় দাঁড়াবার কারণেই ছবিটা চোখে পড়ে গেল সহজেই। পাথুরে দেয়াল খোঁদাই করে আঁকা ছবিটা এমন এক অবস্থানে রয়েছে ঠিক এ জায়গায় না দাঁড়ালে চোখে পড়া অসম্ভব। খুব সাধারণ একটা ছবি। জ্বলন্ত একটা মশালের। কী বোঝাচ্ছে এটা আল্লাহ মালুম। আদৌ কিছু বোঝাচ্ছে কিনা সেটাই বা কে বলবে।

সাইফকে এক দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এল সুমিয়া। পাশে দাঁড়িয়ে সাইফের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল।

‘ছবিটা কী বোঝাচ্ছে?’

‘বুঝতে পারছি না। এত হেঁয়ালি করে শেষ পর্যন্ত এই ছবিটা আমাদের দেখাতে চাইছিল আপনার চাচা? মনে হয় না।’

‘আমারও... এক মিনিট!’

সুমাইয়ার উত্তেজিত কন্ঠ শুনে ঝট করে ওর দিকে তাকাল সাইফ।

‘আমি একবার একটা পিরামিডে গিয়ে গাইডের মুখে শুনেছিলাম, প্রাচীন মিশরীয়রা গোপন দরজা খুলতে মশাল ব্যবহার করত। এমনভাবে মেকানিজম সেট করত যাতে মশালের সাথে দরজার কানেকশন থাকত। মশালে আগুন জ্বালালেই দরজা খুলে যেত আপনাতেই।

‘তাই নাকি?’ নতুন করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে সাইফ। ‘এখন তাহলে আমাদের মশাল খুঁজে বের করতে হবে, তাই তো?’ বলতে বলতেই চোখ বোলাতে লাগল সাইফ। কী খুজতে হবে জানা থাকায় খুঁজে পেতেও সময় লাগল না। দেয়ালের একটা খোপে গুঁজে রাখা হয়েছে একটা পাথুরে মশাল। প্রথমবারও চোখে পড়েছিল সাইফের কিন্তু এটাই যে সম্ভাব্য চাবিকাঠি সেটা

ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি সাইফ।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সাইফ। গভীর মনোযোগে পর্যবেক্ষণ করল। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় মশালটার জ্বালানি ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। নতুন করে জ্বালানি না দিলে জ্বলবে না।

স্থমাইয়াকে ব্যপারটা বুঝিয়ে বলল, 'আপনি তবে এখানে থাকুন, আমি পেট্রোল নিয়ে আসছি গাড়ি থেকে। '

'না না, আমিও যাব আপনার সাথে,' হড়বড় করে বলে উঠল স্থমাইয়া।

হেসে ফেলল সাইফ। 'আমার নিজেরও অবশ্য একা একা এখানে থাকতে ভয় করত।'

'আমার মোটেও ভয় করছে না। মুখ বাঁকাল স্থমাইয়া।

সাইফ ছোট্ট করে হেসে উপরে যাবার রাস্তার দিক এগোলো।

একটা খালি ক্যানে খানিকটা পেট্রোল ঢেলে ফিরে আসতে বেশি সময় লাগল না। ক্যানটা মশালের উপর খালি করে ফেলল সাইফ। লাইটারের শিখা ছোঁয়াতেই দপ করে জ্বলে উঠল মশাল। ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে গেল ঘরটাতে। চারিদিক থেকে গুঞ্জন উঠল। কিছু একটায় সাড়া পড়ে গেছে। গুঞ্জনটা বাড়তে বাড়তে গর্জনে রূপ নিল। গুরু গম্ভীর ঘর ঘর শব্দে ভরে গেলে জায়গাটা। কাপুনি শুরু হল এর পরের ধাপে। গোটা রুম কাঁপছে, ঝাঁকি খাচ্ছে। এক সময় আচমকাই নিভে গেল মশালটা। সেই সাথে অদৃশ্য কারো হাতের ইশারায় যেন থেমে গেল সকল তর্জন গর্জন আর কাঁপুনি। ঝড়ের পরের পরিবেশের মতই শান্ত সব। মশাল নিভে যেতেই আলো কমে গেছে খানিকটা। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় পাশেই দেখা গেল নতুন একটা দরজা।

'এটাই কী...' গলা কেঁপে যেতেই থেমে গেল স্থমাইয়া।

'জানি না, জানতে হবে। সাবধানে আমার পেছনে পেছন আসুন, বিপদ ওঁত

পেতে থাকতে পারে।’

সাইফ এগোলো খুবই সন্তর্পণে। দরজার ওপাশের দৃশ্যটা নজরে আসতেই বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল সাইফের। ওপাশেও ঠিক এটার মতই হুবুহু আরেকটা রুম দেখা যাচ্ছে। ওতেও সাতটা কফিন রাখা সারি দিয়ে।

দ্বিতীয় রুমে ঢোকার আগে ভালমত চোখ বুলিয়ে নিল সাইফ। বিপদের কোনো চিহ্ন আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তবে সাইফের ভালই জানা আছে- যে বিপদ বলে কয়ে আসে সেটা আসলে বিপদই না!

মাঝখানের কফিনটার সামনে এসে দাঁড়াল সাইফ। বড় করে দম নিল। এক ঝটকায় ডালাটা উঁচু করে ধরতেই দ্বিতীয়বারের মত আকাশ ভেঙে পড়ল ওর মাথায়। এবারও বাক্সটা সম্পূর্ণ খালি!

তেরো

তেলআবিব, ইসরাঈল

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অফ ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল এসাইনমেন্ট, সংক্ষেপে মোসাদের হেড কোয়ার্টারে তখন পর্দা উঠছে নতুন এক নাটকের। প্রথম দৃশ্যের কুশীলব দু' জন, মোসাদের ডেপুটি চিফ আব্রাম এয়াহুদ আর ইউরি কোলম্যান। খানিক আগেই স্বদেশের মাটিতে পা রেখেছে ইউরি। সরাসরি চিফের সাথে দেখা করতেই চেয়েছিল ছিল সে, কিন্তু চিফ হোম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে জরুরি মিটিং-এ থাকায় ডেপুটি চিফের কাছেই খুলে বলতে হল গোটা কাহিনি।

সেফ হাউস থেকে সাইফের পলায়ন এবং স্সমাইয়াকে দ্বিতীয়বার কিডন্যাপ করতে গিয়ে সাইফের হাতে ঘোল খেয়ে ইউরি বেশ ভালমতই বুঝে ফেলেছে সাধারণ গুন্ডা-পান্ডা দিয়ে সাইফের সাথে লাগতে যাওয়া মস্ত বোকামি হবে। তাছাড়া পুরো ব্যাপারটা আয়ত্বের বাইরে চলে যাবার আগেই হেড কোয়ার্টারে সব জানিয়ে রাখা ভাল মনে করেছে সে। একা একা হজম করতে গিয়ে বদ হজম হলে পরে তাকে আর আস্ত রাখবে না মোসাদ। এবং সেটাই ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে বেগ পেতে হয়নি ইউরির। আসার আগে সাইফের উপর নজর রাখার জন্য লোক লাগিয়ে এসেছিল সে। এইমাত্র খবর পেল ওরা সাইফের ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছে।

এই মুহূর্তে মুখটা তোম্বা বানিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে আছেন ডেপুটি চিফ। পুরোটা শুনে তিনি মোটামুটি থ হয়ে গেছেন।

'তুমি শিউর ব্যপারটা ট্রেজার নিয়ে?'

‘নিশ্চয়ই স্যার, ট্রেজারের ব্যাপারই যদি না হবে তবে এতদূর থেকে কেন উড়ে আসবে এক বাঙালী মেজর?’

‘এতক্ষণ যা বললে, সব যদি সত্যি হয় তাহলে তুমি বড় ধরনের একটা অন্যায় করে ফেলেছ এতদিন না জানিয়ে।’

গোমড়া মুখে মৌন সম্মতি দিল ইউরি।

ডেপুটি চিফের কথা শেষ হয়নি, আবার খেই ধরলেন তিনি, ‘ব্যাপারটা মনে হচ্ছে আমারও নাগালের বাইরে। চিফকে জানাতে হবে।’ ইন্টারকম তুলে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড কথা বললেন ডেপুটি চিফ। এরপর ইউরির দিকে তাকিয়ে বললেম, ‘চিফ ফিরেছেন, তাকে সব জানাতে হবে, এসো আমার সাথে।’

পরবর্তী আধ ঘন্টায় মোসাদ চীফকে পুরো ঘটনা খুলে বলল ইউরি। ডেপুটির মত না হলেও চিফও বেশ ভাবনায় পড়ে গেছেন মনে হল। চুপ করে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছেন এই মুহূর্তে। এই লোকটাকে বাঘের মত ভয় পায় সার্ভিসের সবাই। বিশেষ করে কোনো সংকটের মুহূর্তে। আর এখন তেমনই একটা সংকট যাচ্ছে মোসাদের উপর দিয়ে। আইজ্যাক কোহেনের ব্যাপারটা নিয়ে চিফকে বেশ ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে।

‘শাইলকের কোনো খবর পাওয়া গেল?’ আচমকা চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন চিফ।

‘না স্যর, ওকে তো চেনেনই নিজের মর্জিমত যোগাযোগ করবে।’ জবাব দিলেন ডেপুটি আব্রাম।

‘ওকে এসাইনমেন্ট শেষ করে দ্রুত দেশে ফেরার নির্দেশ দাও।’

‘স্যর, সেলফোন ছাড়া ওর সাথে যোগাযোগের কোনো উপায় নেই। এমন অনিরাপদ লাইনে যোগাযোগ করাটা...’

‘যা বলেছি সেটাই করো। ওকে দরকার আমাদের।’

‘স্যার, ইউরির ব্যাপারটা বেশ জটিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তাই বলে শাইলককে পাঠাবার মত পরিস্থিতি কি তৈরি হয়েছে?’

‘তোমরা এখনও ওই বাঙালী ছোকরাকে চিনতে পারোনি মনে হচ্ছে। ছোকরা বেশ ঘোড়েল। যদি সত্যি এতে ট্রেজারের সম্পর্ক থাকে আমি রিস্ক নিতে চাই না। শাইলককেই দরকার আমাদের। কল হিম।’

Ebook Created by: Bangla Epub & Mobi Creator Team (fb group)

চোদ্দ

সাইরেনের আওয়াজ শুনতেই খানিকটা সময়ের জন্য বুকের রক্ত ছলকে উঠল আততায়ীর। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এর চাইতেই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ট্রেনিং তাকে দেয়া হয়েছে সুনিপুনভাবে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে তাকে। রিমোর্ট চেপে গেট খুলে ফেলল। পুলিশ পজিশন নেবার আগেই বের হতে পারলে পালাবার একটা সম্ভাবনা আছে।

গেট খুলে যেতেই বুকের সাথে চেপে ধরা লাশটা টেনে হিঁচড়ে সেদিকে এগোলো। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির ভেতর থেকে অপর কমান্ডো এবং সিআইএর স্পেশাল ট্রেনিং প্রাপ্ত মেইড বেরিয়ে এসেছে হাতে উদ্যত অস্ত্র নিয়ে। আগের কমান্ডো বাকি দু' জনকে আসতে দেখেই গুলি ছোড়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিল। এদিকে লাশটাকে নিয়ে এগোনোর ফলে নিজে একটাও বুলেট ছুড়তে পারছে না আততায়ী। ভেতরের কম্পাউন্ডে তিন শত্রুই কাভার নিয়ে ফেলল। ততক্ষণে বাইরে চলে এসেছে আততায়ী। বাইরে এসেই বুঝতে পারল খেল খতম! তিনটা পুলিশের গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত জনা বারো পুলিশ কাভারও নিয়ে ফেলেছে। এক ডজন অস্ত্র লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অথচ সে নিজে বলতে গেলে একেবারেই অরক্ষিত। শুধু বুকের উপর ধরে রাখা একটা লাশই তার রক্ষা কবচ।

'অস্ত্র ফেলে মাথার পেছনে হাত বাঁধো।' হ্যান্ড মাইকে নির্দেশ এলো পুলিশের তরফ থেকে।

আততায়ীর মধ্যে কথাগুলো বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলল না। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

পুলিশকে দেখতে পেয়ে ভেতর থেকে তিন প্রতিপক্ষ গুলি ছোড়া বন্ধ করেছে। পুলিশকেই ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করার সুযোগ দিচ্ছে।

আত্মসমর্পণ করার কোনো ইচ্ছাই নেই আততায়ীর। এর চাইতে হাতের অস্ত্র দিয়ে যে ক'টাকে সম্ভব- সাথে নিয়ে মরাটাই তার কাছে বেশি কাঙ্ক্ষিত। তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাল না ছাড়ার শিক্ষা পেয়েছে সে আর নিজের শিক্ষার উপর তার আস্থা আছে।

'বুকের উপর থেকে লাশটা ফেলে দাও।' আবার নির্দেশ এল।

নির্দেশ শুনে এদিক ওদিক তাকাল আততায়ী। যেন দিশেহারাবোধ করছে। এই ফাঁকে সে লক্ষ্য করে দেখেছে পুলিশের গাড়িগুলো শুধু গেটের সামনের অংশ কাভার করছে। গেটের দু' পাশেই খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা রয়েছে। ডান পাশটা আততায়ীর চাইতে বেশ দূরে, বাম দিকটা সে তুলনায় অনেক কাছে। দেখা শেষ করে আবার অসহায় দৃষ্টি নিয়ে তাকাল পুলিশের দিকে। এখন পর্যন্ত এই গ্যাঁড়াকল থেকে বেরোবার কোনো উপায় খুঁজে পায়নি।

'শেষবারের মত বলা হচ্ছে, লাশটা সামনে থেকে সরিয়ে দাও।' কন্ঠটা এবার বেশ কঠোর শোনাল। শুনেই বোঝা যাচ্ছে, পরেরবার কন্ঠের আগে গুলি আসার সম্ভাবনাই বেশি। আর দেরি করা যাবে না। এখন পর্যন্ত পালাবার কোনো উপায় খুজে পায়নি আততায়ী। শেষ যেটা করার আছে সেটাই করবে বলে ঠিক করল। হাতের গ্লকটা দিয়ে যতটুকু করা যায় আরকি! তবে তার জন্য পুলিশের কথামত লাশ ফেলে দেয়াই ভাল হবে। হাত মুক্ত থাকলে লড়াই করতে পারবে সে।

লাশটাকে ফেলে দেবার জন্য তার কোমরে হাত রাখতেই আবারও বুকের রক্ত ছলকে উঠল আততায়ীর। এবার আতঙ্কে নয়, আনন্দে! কমান্ডোর কোমরের পেছন দিকের একটা পাউচে দুটো গোল বস্তুর অস্তিত্ব টের পেয়েছে সে এইমাত্র। হ্যাঁন্ড গ্রেনেড!

একটু আগেই আততায়ীর চেহারায় নিষ্ঠুরতা ফুটে উঠেছিল। হঠাৎই সেটা কেটে গিয়ে আগের দিশেহারা ভাব ফিরে এল।

‘আমার কিছু কথা আছে।’ গলা উঁচিয়ে নার্ভাস গলায় বলল আততায়ী। হাত ইতোমধ্যেই চলে গেছে কমান্ডোর পাউচের মধ্যে।

পুলিশও খানিকটা অবাক হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ পর হ্যান্ড মাইক থেকে আওয়াজ এল, ‘কী বলবে বলো, তবে কোনো চালাকি না, ওকে?’

‘আমি বলতে চাইছি যে...’ মাথায় টিক টিক করে একটা ঘড়ি বেজে চলেছে আততায়ীর। যেন বেখায়েলে- এক পা এগোলো পুলিশের দিকে। সাথেই সাথেই পুলিশদের হাতের অস্ত্রগুলো আরো সতর্ক হল। ‘আমি বলতে চাইছি যে...’ বাকিটা আর বলা হল না, শোনাও হল না কারো। লাশটাকে ধাক্কা দিয়ে পুলিশের দিকে পাঠিয়ে দিল আততায়ী। পকেটে পিনখোলা গ্রেনেড নিয়ে টলোমলো করতে করতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লাশটা একটা গাড়ির ঠিক সামনেই। একেবারে চুলচেরা হিসেব করা, পড়ে যাবার সাথে সাথেই বিস্ফোরিত হল গ্রেনেড।

লাশটাকে আসতে দেখে পুলিশ এবং ভেতরের তিন প্রতিপক্ষের মনোযোগ মুহূর্তের জন্য সরে গিয়েছিল আততায়ীর উপর থেকে, এই ফাঁকে কয়েক লাফে পিছিয়ে এসেছে সে। হাতে অপর গ্রেনেডটি। এটার পিন খোলা হয়েছে কয়েক সেকেন্ড পর, এবার সেটা উড়ে গেল ভেতরে, তিন কমান্ডোকে লক্ষ্য করে। প্রথম গ্রেনেড বিস্ফোরিত হবার সাথে সাথেই অন্তত এক তৃতীয়াংশ পুলিশ মারা গেছে। দ্বিতীয় দফায় গাড়ির পেট্রোল ট্যাংক বিস্ফোরিত হতেই ঝাড়ে বংশে শেষ হয়ে গেল পুরো পুলিশ টিম।

অপরদিকে ভেতরে ছোড়া দ্বিতীয় গ্রেনেড তেমন ক্ষতি করতে পারল না প্রতিপক্ষরা সবাই কাভার নিয়ে ফেলায়। তবে সবচাইতে কাছের জন্য আহত হল মারাত্মক। বাকি দু’ জনের অবস্থা দেখার জন্য বসে নেই আততায়ী। হাতের অস্ত্র খালি করে ফেলল তিনজনের অবস্থান লক্ষ্য করে। ম্যাগাজিন খালি হতেই ছুটল আধব্লক দূরে রাখা গাড়িটার দিকে। ভেতরের তিন শত্রু

জীবিত থাকলেও ওকে ধাওয়া করার মত সক্ষমতা অর্জন করতে করতেই ও হারিয়ে যেতে পারবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নির্বিঘ্নে গাড়িতে উঠে পড়ল সে। ড্রাইভিং সিটে বসে স্টার্ট দিতেই ফোন বেজে উঠল তার। স্ক্রিনের দিকে তাকাতে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ঠোটের কোণে।

‘শাইলক স্পিকিং!’

পনেরো

দেঁতো হাসি হাসতে থাকা খালি বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বসে পড়তে খুব ইচ্ছে হল সাইফের। এতটা হতাশ এর আগে কখনও হয়নি। হয়ত বসেই পড়ত যদি না পাশ থেকে সুমাইয়ার আতকে ওঠার অস্ফুট আওয়াজটা না শুনত। সাইফের দেখাদেখি সুমাইয়াও পাশের বাক্সটা খুলে ফেলেছে। সে বাক্সের দিকে তাকিয়ে দম বন্ধ হবার যোগাড় হল সাইফের। এ বাক্সটা অপেক্ষা করছিল রাজ্যের যত বিস্ময় নিয়ে। বিপুল ঐশ্বর্যের বিস্ময়। ফারাও রাজার ট্রেজার!

কয়েক মুহূর্ত নিজের দৃষ্টির উপর আস্থা আনতে পারল না সাইফ। মস্তিষ্ক স্থবির হয়ে পড়েছে আকস্মিক আবিষ্কারে। হয়ত চরম হতাশার পর সাফল্য এমনই অবিশ্বাস্য মনে হয়। উত্তেজনায় সাইফ আগে লক্ষ্যই করেনি মাঝের বাক্সটা মূলত খালিই থাকার কথা। কারণ এই বাক্সটায় যে মমি ছিল সেটা এখন শোভা পাচ্ছে বাইরের রুমের কফিনে।

'ওফ খোদা!' বলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সাইফ। আরো কিছুক্ষণ পর নড়াচড়ার শক্তি অর্জন করতে পারল। পাগলের মত একে একে বাকি ছয়টা বাক্সের ডালা খুলল। প্রতিটা বাক্সই স্বস্তির শিতল পরশ বুলিয়ে গেল। প্রতিটাই কানায় কানায় পূর্ণ। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় দ্যুতি ছড়াচ্ছে কাঁচা সোনা, নাম না জানা শত রত্ন! পেয়ে গেছে সাইফ সহস্রপ্রাচীন গুপ্তধনের সন্ধান।

দম বন্ধ করা সৌন্দর্যে দুজনেই নির্বাক তাকিয়ে আছে খোলা ছয়টা বাক্সের দিকে।

'ক...কংগ্রাচুলেশনস।' নীরবতা ভাঙল সুমাইয়া।

'থ্যাংক ইউ।'

‘ওয়েলকাম!’

‘এগুলোর দাম কত?’

‘আন্দাজ করতেও ভয় হচ্ছে! শুধু সোনা আর রত্নের বাজার মূল্যই হবে কয়েক বিলিয়ন ডলার, সেই সাথে অ্যান্টিক ভ্যালু যুক্ত হয়ে এগুলোকে অমূল্য করে তুলেছে।’

দুজনের কেউই চোখ সরাতে পারছে না বাক্সগুলো থেকে। নিজেকে ফিরে পেল সাইফই আগে। আস্তে করে এগিয়ে গেল একটা বাক্সের দিকে। ব্ল্যাক ডায়মন্ডের একটা অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর আঙটি অনেকক্ষণ ধরেই ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওটা সাইফ। ফিরে এল সুমাইয়ার পাশে। মেয়েটার হাত তুলে নিয়ে অনামিকায় আঙটিটা পরিয়ে দেবার পরই মেয়েটার ঘোর কাটল।

‘এটা কী করছেন?’ বলে হাত থেকে আঙটিটা খুলে ফেলতে গেল সুমাইয়া।

‘ভয় পাবার কিছু নেই, ওটা এঙ্গেজমেন্ট রিং না!’

লজ্জায় রাঙা হল সুমাইয়া। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোতেও নজর এড়াল না সাইফের।

‘কিন্তু... এটা আমি নিতে পারি না।’

‘অবশ্যই নিতে পারেন না। আপনি সেটা করেননিও, আমি দিয়েছি। ছোট্ট একটা উপহার বলতে পারেন।’

‘কিসের জন্য?’

‘এতক্ষণ ধরে খাড়া আছেন তাই!’ ফিচেল হাসি হাসল সাইফ।

আবারও রাঙা হল মেয়েটার মুখ। এবার সম্ভবত রাগে। রেগেমেগে কিছু বলতে যাবার আগেই সাইফ প্রসঙ্গ পাল্টাল, ‘এখন বেরুতে হবে এখান থেকে।

মোসাদ আমাদের হারিয়ে ফেললেও যদি সন্দেহের বশে এখানে চলে আসে তাহলে সব শেষ।’

সাইফ এগিয়ে গিয়ে সবগুলো বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিয়ে রুমটা থেকে বেরিয়ে এল। মশালে আগুন দিতেই পুনরাবৃত্তি ঘটল ঘটনার। তর্জন-গর্জন আর কাঁপুনি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। এরপর বহু খুজেও সাইফ বুঝতেও পারল না, দরজাটা আসলে কোথায় ছিল!

* * *

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সাইফের। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হল। এখন খুব ভোর। আরেকটু পরই সূর্য উঠবে। এ সময় কে আসবে? সতর্ক হবার প্রয়োজনবোধ করল সাইফ। বালিশের নিচ থেকে ডেজার্ট ঈগলটা বের করে হাতে নিল। পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে চোখ রাখল পিপহোলে। ওপাশে স্থমাইয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হতে হল ওকে। মেয়েটার চেহারায় দুশ্চিন্তার সামান্য ছাপ থাকলেও মনে হচ্ছে না কেউ আড়াল থেকে পিস্তল ধরে ওকে দরজায় নক করাতে বাধ্য করেছে। দরজা খুল দিল সাইফ।

‘আপনি?’

‘আপনার সাথে কথা আছে।’

সাইফ কথা না বলে দরজা ছেড়ে দিল। ভেতরে ঢুকে মুখোমুখি সোফায় বসল দুজনে।

‘আপনি কি চলে যাবেন?’ প্রথমে স্থমাইয়াই কথা বলল।

‘নাহ, ভাবছি ট্রেজার বিক্রি করে কফিশপ দেব একটা, চলবে না?’ স্থমিয়াকে কটমট করে তাকাতে দেখে রসিকতা তুলে রাখল সাইফ। ‘চলে তো যেতেই

হবে। যে জন্য এসেছিলাম সেটা পেয়ে গেছি। আমার দেশ অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য।'

'আমিও যাব।'

হাই আসছিল একটা, স্মমাইয়ার কথা শুনে ওটা বন্ধ হয়ে গেল।

'কোথায় যাবেন?'

'বাংলাদেশে।'

রসিকতা করে কিছু বলতে গিয়েও বলল না সাইফ। 'কেন, জানতে পারি?' গম্ভীর হয়ে গেছে।

'আমি আপনাদের সিক্রেট সার্ভিসের জন্য কাজ করতে চাই।'

'এ ক'দিন আমার সাথে থেকেও বোঝেননি কাজটা কী পরিমাণ ঝুঁকিপূর্ণ? যদি না বুঝে থাকেন তাহলে বলি, বিপদের কিছুই আপনি দেখেননি। বিপদ সামনে আসছে। মোসাদ তার মরণকামড় বসাবে এবার।'

'হ্যাঁ, বুঝেছি, আর বুঝেছি বলেই আমি আপনাদের সাথে কাজ করতে চাচ্ছি। আমি জার্নালিজমে পড়েছি এই একটা কারণেই। আমি ঝুঁকি নিতে পছন্দ করি।'

'ম্যাম, জার্নালিজম আর স্পাইগিরির মধ্যে পার্থক্য আছে। এর জন্য কঠোর ট্রেনিং এর মধ্য দিয়ে যেতে হয় একজন মানুষকে।'

'বেশ তো, আমিও ট্রেনিং নেব। মায়ের পেট থেকে তো আর নিশ্চয়ই কেউ এসব শিখে আসে না। আর ঝুঁকির কথা বলছেন? গৃহিণীরা কি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে রান্নাঘরে বসে মারা যায় না?'

অকাট্য যুক্তি! সাইফ খানিকটা ভাবার অবকাশ পেল। মেয়েটাকে এখানে একা রেখে যাওয়াতে মোসাদের তরফ থেকে বিপদের ভয়ও থাকবে।

'ভিসা?'

‘তিনমাসের টুরিস্ট ভিসা পেয়েছি। আপাতত আগে যাই, পরেরটা পরে দেখা যাবে।’

‘ভিসা পেয়েছেন মানে?’

‘সিদ্ধান্তটা তো আর আজই নিইনি!’

‘আপনার বাবা রাজি হবেন না।’

‘ও দায়িত্ব আমার!’ বলেই মুচকি হাসি দিয়ে উঠে গেল মেয়েটা। যেন সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেল- আমি যাচ্ছি!

ষোল

কর্নেল আজহার চৌধুরী বরাবরই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হলেও তার চেহারায় দুঃশ্চিন্তার ছাপ কখনও তেমন একটা চোখে পড়েনি জাফরের। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে সেটাই দেখতে হচ্ছে তাকে। সাইফ হাসান সেদিন বাড়িতে আসার পর থেকেই দুঃশ্চিন্তার মুখোশ পাকাপাকি এঁটে বসেছে কর্নেলের মুখে। খাবার যেভাবে কর্নেলের রুমে নিয়ে যায় প্রায় সেভাবেই পরের বেলায় ফেরত আনতে হয়। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই সব কিছু বদলে যেতে লাগল। কর্ণেলকে অনেকদিন পর বেশ উৎফুল্ল মনে হল। সে রাতেরই গভীরে একটা গাড়ি এসে থামল কর্নেলের বাড়ির দরজায়। চারজন আগন্তুক নিয়ে কর্নেল রুদ্ধদ্বার মিটিং-এ বসলেন। শেষ রাতে বিদায় নিল রহস্যময় আগন্তুকরা।

সতেরো

নাইল শিপিং করপোরেশনের বহুতল ভবনের সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়াতেই হকচকিয়ে গেল সাইফ।

ট্রেজার পাবার পরই সবচাইতে বড় চিন্তা ছিল ওগুলোকে এখান থেকে বের করে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া। বলাই বাহুল্য কাজটা করতে হবে সমুদ্রপথে। কিন্তু এই বিদেশ বিভূঁইতে জাহাজ পাবে কোথায় সাইফ? ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে পড়ে আহমাদ হোসেনের কথা। লোকটাকে বাঁচিয়েছিল ও হোটেল হিলটনে তার পার্টনারের হাত থেকে। লোকটা নিজের কার্ড দিয়েছিল সাইফকে। যদিও ব্যস্ততার কারণে দেখা হয়নি কিন্তু সাইফের মনে ছিল লোকটা একজন ব্যবসায়ী, অনুরোধ করলে হয়ত জাহাজের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। খুঁজে পেতে কার্ডটা বের করে চোখ বোলাতেই হতভম্ব হয়ে যায় সাইফ। লেখা ছিল:

আহমাদ হোসেন

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাইল শিপিং করপোরেশন

মেঘ না চাইতেও একেবারে টর্নেডো টাইপ ব্যাপার!

সকাল হতেই নাইল শিপিং করপোরেশনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে সাইফ। এখানে এসে দ্বিতীয়বারের মত হকচকিয়ে গেছে নাইল শিপিং করপোরেশনের বিশালতা উপলব্ধি করে। ট্যাক্সিকে শুধু নাম বলাতেই চিনে ফেলায় ওর ধারণ ছিল কোম্পানিটা বেশ প্রসিদ্ধ হবে, এতটা হবে ভাবেনি।

নাইল মিশরের সবচাইতে বড় শিপিং করপোরেশনগুলোর অন্যতম। গোটা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটা সমুদ্রপথে ভেসে বেড়াচ্ছে নাইলের কয়েকশো জলযান।

নাইলের বহরে রয়েছে বিলাসবহূল ইয়ট থেকে শুরু করে বিশালাকৃতির স্যুপার ট্যাংকার পর্যন্ত।

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে বিশাল ভবনটার দিকে এগোলো সাইফ। সিকিউরিটি বেশ কড়া। পুরো দস্তুর সার্চ করা হল ওকে, এরপর অনুমতি মিলল ভেতরে যাবার। সাইফ সোজা রিসিপশনে চলে এল।

'হাউ মে আই হেল্প ইউ স্যর?' কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে সুন্দরী রিসিপশনিস্ট জানতে চাইল।

'আমি সাইফ হাসান। আহমাদ হোসেনের সাথে দেখা করতে চাই।'

খটখট শব্দে ল্যাপটপের কীবোর্ড চেপে মেয়েটা বলল, 'দুঃখিত স্যর, আপনার এপয়েন্টমেন্ট নেই দেখতে পাচ্ছি।'

'নেই। তবে ব্যাপারটা খুব জরুরি।'

'সরি, স্যর। ' বলেই আবার ল্যাপটপে মনোযোগ দিল মেয়েটা।

'এক্সকিউজ মি, আমি জানি এভাবে অনুরোধ করা ঠিক হচ্ছে না, তবে আমি একটা নোট লিখে দিচ্ছি আপনি দয়া করে সেটা তাঁকে পৌঁছবার ব্যবস্থা করুন। এরপরও তিনি দেখা করতে রাজি না হলে আমি চলে যাব।'

'দুঃখিত সেটাও সম্ভব না। স্যর মিটিং-এ আছেন।' এবার বেশ রুষ্ট শোনাল মেয়েটার গলা।

'আপনার বস হেঁটে হেঁটে মিটিং করেন জেনে ভাল লাগল!'

'সরি!'

সাইফকে কিছু বলতে হল না। মেয়েটা সাইফের দৃষ্টি অনুসরণ করেই জবাব পেয়ে গেল। নাইল শিপিং করপোরেশনের কর্ণধার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।

মিথ্যে ধরা পড়ে যাওয়ায় লজ্জা পেলেও সেটা তেমন স্থায়ী হল না। পরের

দৃশ্যটা তাকে রীতিমত চমকে দিল। তাদের রাশভারী মালিক সাইফকে দেখে প্রায় বাচ্চা ছেলের মত দৌড়ে এলেন। বাল্যকালের বন্ধুর মত জাপটে ধরলেন পরিবেশ ভুলে। এরপর হড়বড় করে কিছু কথা বলে প্রায় বগলদাবা করে নিয়ে চললেন উপরে।

সাইফ যেতে যেতে একবার ফিরে তাকাল রিসিপশনিস্টের দিকে। মেয়েটা দু' চোখে নীরব আকুতি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মুচকি হেসে সাইফ বুঝিয়ে দিল, ভয় নেই, মেয়ে, আমি নালিশ করব না তোমার নামে!

* * *

সাইফের প্রবল আপত্তি সত্বেও আপ্যায়নের বিরাট আয়োজন করা হল, সাইফ সেসব গলধঃকরণ করার আগ পর্যন্ত কিছু শুনতে রাজি নন আহমাদ হোসেন। অতঃপর গলা পর্যন্ত নাস্তা করে এখন কফি নিয়ে বসেছে দু' জন। কফি খেতে খেতেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বলল সাইফ, কোনো রাখঢাক না করেই। এই মানুষটার সাহায্য তার খুবই প্রয়োজন। চাইলে অন্য কোথাও টাকা দিয়ে সার্ভিস পাওয়া যাবে কিন্তু বিশ্বস্ততা নয়, যেটা দিতে পারবে আহমাদ হোসেন। আর তার জন্য সব কিছু খুলে বলার বিকল্প নেই।

'আমি গর্ববোধ করছি আপনি সবার আগে আমাকে স্বরণ করেছেন দেখে। এখন বলুন আমি ঠিক কী সাহায্য করতে পারি।' সব শোনা হতে মুখ খুললেন আহমাদ হোসেন।

'আমি একটা প্ল্যান দাঁড় করিয়েছি ট্রেজার বের করে নিয়ে যাবার জন্য। আমি সেটা আপনাকে বলছি, শুনলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কতটুকু করতে পারবেন আমার জন্য।' প্ল্যানটা খুলে বলল সাইফ।

'জাহাজের ব্যাপার নিয়ে টেনশন করতে হবে না সেটা তো বুঝতেই পারছেন। লোকবলও আমি যোগাড় করে পারব। কতজন দরকার আপনার?'

‘চার পাঁচজন। তবে সবাইকে অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে।’

‘সে আর বলতে। এরা আমার কোম্পানির সিকিউরিটির লোক। আমার কথায় জীবন দিতে এবং নিতেও পারে। দাঁড়ান এখনই পরিচয় করিয়ে দেয়া যাক।’ ইন্টারকম তুলে নিলেন আহমাদ হোসেন। কাকে যেন দু’ একটা নির্দেশ দিলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রুমের দরজায় টোকা পড়ল।

‘কাম ইন।’

দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল পাঁচজন লোক। পরনে ইউনিফরম। শক্ত সমর্থ গড়ন। একজন বাদে বাকিদের বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ। বাকিজন বোধহয় চল্লিশ পার করেছে। বোঝা যাচ্ছে সেই দলনেতা। সাইফের ধারণাই সত্যি হল। পরিচয় করিয়ে দিলেন আহমাদ হোসেন।

‘ও আকিল হাসান, আমার সিকিউরিটি ইনচার্জ। এক্স আর্মিম্যান। আর ও আনোয়ার ইব্রাহিম, বাদরু আজিজি, আবু গায়াসি, আর জাহী হামাদি।’ একে একে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আহমাদ হোসেন। এরপর সাইফের পরিচয় দিলেন বাকিদের কাছে। সাইফের মেজর পরিচয় ওদের চেহারায় সমীহের ভাব এনে দিল।

পরিচয় পর্ব শেষ হতে সাইফের আগমনের উদ্দেশ্য এবং পরবর্তী পরিকল্পনা সংক্ষেপে খুলে বললেন আহমাদ হোসেন।

আধঘন্টা পর মুখে স্বস্তির ছাপ নিয়ে বেরিয়ে এক সাইফ নাইল শিপিং করপোরেশনের অতিকায় ভবন থেকে।

* * *

সাইফ যখন হোটেলে প্রবেশ করছে ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ একজন সন্তর্পণে বেরিয়ে এল সাইফের রুম থেকে। লোকটা এইমাত্র ওর রুমে একটা শক্তিশালী মাইক্রোফোন বসিয়ে গেল। এর পেছনে রয়েছে মোসাদের টপ এজেন্ট

শাইলকের পরোক্ষ নির্দেশ।

আমেরিকা থেকেই সরাসরি কায়রো চলে এসেছে শাইলক। ইউরিও চলে এসেছে কায়রো। তার কাছেই পুরো এসাইনমেন্টের ব্রিফিং পেয়েছে সে।

পুরো ঘটনা ইউরির মুখে শোনার পর শাইলকের প্রথম কথা ছিল, 'গোটা ব্যাপারটাই ভুলে ভরা। প্রথম ভুল, সাইফ আর ওই মেয়েটাকে কিডন্যাপ করে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেয়া। দ্বিতীয় ভুল, মেয়েটাকে আবারও কিডন্যাপের চেষ্টা করা। এবং তৃতীয় ভুল, সাইফের পেছনে ফেউ লাগানো। এই তিনটা ভুলের কারণে সাইফ আমাদের পরিচয় আর উদ্দেশ্য জেনে ফেলেছে। ফলে এখন ও আগের চাইতেও অনেক বেশি সতর্ক। অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ট্রেজার ছিনিয়ে নেবার অবস্থানে আমরা আর নেই।'

লজ্জা পেল ইউরি। ডেস্ক ওয়ার্কার আর ফিল্ড এজেন্টের পার্থক্য পরিষ্কার ধরতে পারছে।

'এখন তাহলে কী করার?'

'ওর রুমে ছাড়পোকা বসাবার ব্যবস্থা করুন।

এসাইনমেন্টে থাকলে সাইফের চিরকেলে অভ্যেস- রুম থেকে বেরোবার আগে দরজার ফাঁকে একটা চুল গুঁজে রেখে যায়। এতদিন চুলটা জায়গামত পেলেও আজ সেটাকে যথাস্থানে দেখা যাচ্ছে না। চুলটা এমনভাবে সেট করা ছিল দরজা না খুললে পড়ে যাবার উপায় নেই। সাইফ করিডরের দু' পাশটা চকিতে দেখে নিল; দেখা যাচ্ছে না কাউকে। ডেজার্ট ঈগল সাথে নিয়ে বেরোয়নি 'নাইল' -এ যাবে বলে। সতর্কতার সাথে দরজার নবে হাত রাখল। বড় করে দম এক ঝটকায় দরজা খুলেই শরীরটা গলিয়ে দিল ভেতরে। কাভার নিল কাবার্ডের আড়ালে। কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে না। উঠে দাঁড়িয়ে গোটা রুমে চোখ বোলালো। আস্তে আস্তে সার্চ শুরু করল। পুরো রুমে সার্চ করেও কোনো অসামঞ্জস্য ধরা পড়ল না, কিছু খোয়াও যায়নি। তবে কেন এসেছিল

অবাঞ্চিত অতিথী? একটাই উদ্দেশ্য থাকতে পারে... আইডিয়াটা মাথায় আসতেই আবার সার্চ শুরু করল। অবশেষে ইন্টারকমের রিসিভার খুলতেই খোঁজ পাওয়া গেল ওটার। ক্ষুদে মাইক্রোফোনটা দেখেই ক্রুর হাসি ফুটে উঠল সাইফের ঠোটের কোণে। মাইক্রোফোনটা ইন্টারকমের পাশে রেখেই স্যুমাইয়াকে ডাকতে গেল ওর রুমে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই স্যুমাইয়াকে নিয়ে ফিরে এল সাইফ। মুখোমুখি বসল সোফাতে। মুখ খুলল সাইফ।

‘ট্রেজার যেহেতু পেয়ে গেছি আপনাদের আর কষ্ট দেব না। আপনারা কাল বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন। আমি রাতে ট্রেজার নিয়ে রওনা হব।’

স্যুমাইয়া কিছু বলত যাচ্ছিল সাইফ কথা ঘুরিয়ে ফেলল। আরো টুকটাক দু একট কথা বলে মেয়েটাকে রুমে ফিরিয়ে দিয়ে এল।

টোপ ফেলা হয়ে গেছে, এবার শিকারের অপেক্ষা!

* * *

সেদিন দুপুরে। অডিও ক্লিপটা মনোযোগ দিয়ে শুনল শাইলক। পাশেই বসে আছে ইউরি কোলম্যান, দরজার কাছে দেহরক্ষীর ভঙ্গিমায় বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মোবারক। সেদিকে একবার তাকিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে হেসেছে শাইলক।

‘ট্রেজার পেয়ে গেছে ওরা।’ যেন খবর দিল শাইলককে ইউরি।

‘হুম, এবং ট্রেজার বের করে নিয়ে যাবার প্ল্যানও করে ফেলেছে।’

‘কীভাবে, বুঝতে পারছো কিছু?’

‘অবশ্যই সমুদ্রপথে। এয়ারপোর্টে ট্রেজার নিয়ে যাবার বোকামি করবে না

সাইফ। হোটেলে আমাদের এজেন্টকে সতর্ক করে দিন, সাইফের প্রতিটা মুভমেন্টের খবর আমার চাই। বিশেষ করে চেক আউট করামাত্রই যেন আমি জানতে পারি। আর কয়েকজন দক্ষ লোককে স্ট্যান্ডবাই রাখুন। রাস্তার গুন্ডাপান্ডা না হলেই ভাল!'

খোঁচাটা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মোবারকের ভালই লাগল। ইউরির মুখটাও মুহূর্তের জন্য কালো হয়ে গেল। কিন্তু শাইলকের উপর দিয়ে কথা বলার সাহস তার নেই। মোসাদের এই দুর্দান্ত এজেন্ট কাউকে গোণায় ধরে না। এমনকি মোসাদ চিফের রুমেও যখন তখন ঢুকে পড়ে। বিশেষ করে সদ্যই যে এসাইনমেন্ট শেষ করে এল, এরপর থেকে তার প্রতি সবার সমীহ আরো কয়েক কাটি বেড়েছে। আইজ্যাক কোহেন কিলিং মিশনটা ছিল এক কথায় সুইসাইড মিশন।

'আর সুয়েজ ক্যানেলে একটা শক্তিশালী বোট চাই, এমুনিশন সহ।' চাহিদা জানান দিল শাইলক।

'থাকবে। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, সাইফ নিশ্চয়ই একা একা ট্রেজার বের করে নিয়ে যেতে পারবে না। বিশ্বস্ত লোক লাগবে অবশ্যই। কোথায় পাবে সেটা?' প্রশ্ন করল ইউরি।

'এই একটা প্রশ্নের উত্তর আমিও খুঁজে চলেছি অনেকক্ষণ ধরে।' চিন্তিত দেখাল শাইলককে।

* * *

পরদিন। আজই মিশরে শেষ রাত সাইফের জন্য। সন্ধ্যা ঘনাতেই ডিনার সেরে নিল ধীরে সুস্থে। দিনের বেলাতেই সুমাইয়া আর শেইখ সালাহউদ্দীনকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

ডিনার শেষ হতে না হতেই আকিল হাসানের কল এল সাইফের ফোনে। জানাল, নিচে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেছে সে।

শেষবারের মত রুমে চোখ বুলিয়ে নিল সাইফ। কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে রুমটার প্রতি। সব কিছু চেক করে বেরিয়ে এল। চেক আউট করে ড্রাইভওয়েতে পা রাখতেই আকিলকে দেখা গেল একটা কালো রেঞ্জ রোভার নিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্য। সাইফকে আসোতে দেখেই দরজা খুলে দিল।

'এখন মিস সুমাইয়ার বাড়িতে যাব?'

'হ্যাঁ।' ছোট্ট করে জবাব দিল সাইফ।

গাড়ি ছেড়ে দিল আকিল।

সন্ধ্যা থেকেই ঘুরঘুর করছিল এক লোক হোটেলের ড্রাইভয়েতে। গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগ মুহূর্তে একটা ক্ষুদে বিপার লাগিয়ে দিতে তেমন অসুবিধায় পড়তে হয়নি তাকে। গাড়ি স্টার্ট দিতেই একটিভ হল সেটা। আধমাইল পেছনে থাকা শাইলকের রিসিভারে স্পষ্টই জানিয়ে দিল সাইফের গাড়ির অবস্থান। দূরত্ব না কমিয়েই ড্রাইভারকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিল শাইলক।

মিনিট বিশেক পরেই সাইফের গাড়ি শেইখ সালাহউদ্দীনের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। এখানে কিছু সময় গেল বিদায় পর্বে। সুমাইয়াকে যতটা মনে করেছিল মেয়েটা নিজেকে তার চাইতেও শক্ত প্রমাণ করল। কান্নাকাটি ছাড়াই বাপকে বিদায় জানাল, অথবা ও পর্ব আগেই সেরে নিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন আরোহীকে নিয়ে গাড়িটা শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল। হাইওয়ে ধরে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলল কিছুক্ষণ। কিছুদুর যাবার পরই দুটো ট্রাককে থেমে থাকতে দেখা গেল রাস্তার পাশে। গাড়ি থামিয়ে দিল আকিল। ট্রাক দুটোর একটা খালি, আরেকটাতে পোর্টেবল ক্রেন বসানো রিয়েছে একটা। দুটো ট্রাকেই দুজন করে আরোহী।

‘অল ওকে?’ গলা উঁচিয়ে প্রশ্ন করল সাইফ।

‘ইয়েস বস!’

লোকগুলো তেমন কোনো কারণ ছাড়াই সাইফকে বস বলে ডাকা শুরু করেছে। মাত্র একদিনের পরিচয়েই ওকে দারুণ পছন্দ করে ফেলেছে কঠোর এই মানুষগুলো।

‘আল্লাহর নাম নিয়ে তবে যাত্রা শুরু করা যাক।’

খানিকবাদেই গাড়ির ছোট্ট বহরটা রওনা হয়ে গেল ধ্বংসপ্রায় পিরামিডটার উদ্দেশ্যে।

পাক্কা এক ঘন্টা লাগল গন্তব্যে পৌছতে। জায়গামত পৌছেই ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও ট্রাকের ব্যাটারির সাহায্যে দুটো শক্তিশালী লাইট জ্বালানো হল। একটা লাইট বড় কেবলের সাহায্যে পাঠিয়ে দেয়া হল পিরামিডের অভ্যন্তরে ট্রেজাররুমে। বাকিটা বাইরেই থাকল। ক্রেনের দায়িত্বে আবু গায়াসিকে রেখে সুমাইয়া বাদে বাকিরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। এই পাঁচজনের কাজ ট্রেজাররুম থেকে বাক্সগুলো প্রবেশপথের নিচে এনে রাখা, আবু গায়াসি ক্রেনের সাহায্যে সেটা তুলে রাখবে খালি ট্রাকটায়।

সোনার মত ভারী ধাতুর কারণে বাক্সগুলো জগদ্দল পাথরের মতই ভারী। পাঁচজন শক্তিশালী মানুষেরও কালঘাম ছুটে যাচ্ছে! এক ঘন্টার বেশি লেগে গেল ছয়টা বাক্স ট্রাকে ওঠাতে। খানিক বিশ্রাম নিয়ে তেরপল দিয়ে বাক্সগুলো বাঁধতে বাঁধতে আরো আধঘন্টা।

ক্রেনের কাজ শেষ, সেই সাথে আবু গায়াসিরও। ক্রেন বসানো ট্রাকটা নিয়ে ফিরে যেতে হবে ওকে। মন খারাপ হয়েছে বেচারার, বোঝাই যাচ্ছে। তবে কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতেই হবে, মেনে নিয়েছে সে।

আবু গায়াসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আনোয়ার ইব্রাহিম আর বাদরু আজিজি

উঠে পড়ল ট্রেজার ভর্তি ট্রাকে। বাকিরা রেঞ্জ রোভারে। রওনা হয়ে গেল সুয়েজ ক্যানেলের উদ্দেশ্যে। দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার।

ঠিক সেই মুহূর্তেই নড়ে উঠল কিছুটা সামনে এগিয়ে থাকা শাইলকের গাড়িটা। সেই সাথে শুরু হয়ে গেল অঘোষিত যুদ্ধটাও।

আঠারো

স্যুয়েজ ক্যানেল, মিশর।

পৃথিবীর অন্যতম কৃত্রিম খাল স্যুয়েজ। স্যুয়েজকে'হাইওয়ে টু ইন্ডিয়াও' বলা হয়। ভু-মধ্যসাগর ও রেড সি এর সঙ্গে সংযুক্ত এই আর্টিফিশিয়াল ক্যানেল। প্রথমে এটি ১৬৪ কি.মি. দীর্ঘ ও ৮ মিটার গভীর ছিল। ১৮৫৯ সালে এর চারদিকে খননকাজ শুরু হয়। দীর্ঘ দশ বছর পর ১৯৬৯ এ যখন এর কনস্ট্রাকটশন কাজ শেষ হয় তখন এর দৈর্ঘ দাঁড়ায় ১৯৩ কি.মি., গভীরতা ২৪ মিটার ও প্রশস্ততা ৬৭৩ ফুট। ১৯৬৯ সালের পর থেকে স্যুয়েজ আফ্রিকার সাথে এশিয়া ও ইয়োরোপের সামরিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগকে স্যুগম করেছে। পোর্ট সাঈদে এসে পৌঁছল সাইফদের গাড়িদুটো। খানিক আগেই এসে পৌঁছেছে শাইলকও। ইউরি আগেই একটা দ্রুতগতির বোট ভাড়া করে রেখেছিল। দলবল নিয়ে ওটায় উঠে বসেছে শাইলক। বোটের সবগুলো বাতি এই মুহূর্তে নেভানো। পোর্ট থেকে চুইয়ে আসা আলোতেই কাজ সারার নির্দেশ দিয়েছে শাইলক। সে এতক্ষণ বোটের ব্রিজে দাঁড়িয়ে বিনকিউলার দিয়ে লক্ষ্য রাখছিল। সাইফরা এসে পৌঁছনোমাত্রই শাইলকের চোখে ধরা পড়ে গেল। হিংস্র শ্বাপদের মত একটা হাসি ফুটে উঠল শাইলকের ঠোঁটের কোণে।

সাইফদের গাড়ি থামতেই আকিল নেমে গেল। মাল লোডিং এর ব্যবস্থা করতে গেছে। সাথে আনোয়ারকেও নিয়ে গেল।

সাইফ ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে বসা স্যুমাইয়ার দিকে তাকাল।

'কেমন বোধ করছেন?'

'সত্যি বলব না মিথ্যা?'

'চাইলে মিথ্যা বলে দেখতে পারেন ধরতে পারি কিনা!'

'ভয় করছে কিছুটা।'

'মিথ্যা বলার সাহস হল না তাহলে?' হেসে উঠল সাইফ।

স্যুমাইয়া কটমট করে ওর দিকে তাকাতেই তড়িঘড়ি বলে উঠল সাইফ,'ভয় নেই। আচ্ছা, আপনার ট্রেনিং এখন থেকেই শুরু করা যাক।'

সিটে হেলান দেয়া ছিল স্যুমাইয়া। সাইফের কথা শুনে সোজা হয়ে বসল।'কী ট্রেনিং?'

'আপনাকে মিথ্যে অভয় দেব না। আমি নিশ্চিত মোসাদ একটা হামলা চালাবেই। ওদের নীরবতা সেটাই বলছে। হয়ত এর মধ্যে পৌঁছেও গেছে এখানে।'

স্যুমাইয়া জানালার দিয়ে এদিক ওদিক তাকাল চোরা চোখে। যেন তাকালেই মোসাদকে মিসাইল নিয়ে বসে থাকতে দেখা যাবে!

'এজন্য আপনাকে অস্ত্র চালাবার প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়ে রাখতে চাই। বিপদে কাজে আসবে।'

'নিশ্চয়ই।' আগ্রহের আতিশয্যে আরো খানিকটা এগিয়ে এল স্যুমাইয়া।

ড্রাইভিং সিটে বসা জাহীর দিকে ফিরল সাইফ।

'ম্যাডামকে একটু পিস্তল চালানো শিখিয়ে দাও যেন কাঁপাকাঁপি ছাড়াই পিস্তল ধরতে পারে! আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।' স্যুমাইয়াকে কিছু বলার স্যুযোগ না দিয়েই গাড়ি থেকে নেমে গেল সাইফ। প্রবাদ আছে সমুদ্র বন্দর কখনই ঘুমায় না। স্যুয়েজ তো আরো নিশাচর। এত রাত তবুও কর্ম ব্যস্ততা কম নয়। সাইফ গাড়ি থেকে নামা মাত্রই শাইলকের বিনকিউলারের আওতায়

পড়ে গেল।

এই তাহলে সেই পুচকে ছোঁড়া! বিড়বিড় করল শাইলক।

সাইফ সিগারেট খায় না কিন্তু ওর মনে হচ্ছে এ ধরনের মুহূর্তে সিগারেট হয়ত বেশ কাজে দেয়। এদিক ওদিক তাকাতেই আকিল আর ইব্রাহিমকে আসতে দেখল সাইফ।

'কোনো সমস্যা?' গলায় খানিক উদ্বেগ ফুটল সাইফের।

'মাল লোডিং এর ব্যবস্থা করে এলাম।'

'এত তাড়াতাড়ি!'

'এখানে আমাদের বসের বিশেষ প্রভাব আছে,' চোখ টিপল আকিল।

সাইফ বুঝল কিছু লেনদেন হয়েছে। সাইফের জন্য প্রচুর শ্রম ও অর্থ ব্যয় করছে আলী আহমাদ। বিনিময়ে একটা পয়সা নিতেও রাজি করাতে পারেনি সাইফ তাকে। কিছু কিছু মানুষ ঋণ শোধ করতে গিয়ে উল্টো ঋণী করে ফেলে।

পরবর্তী আধঘন্টার মধ্যে ব্লু-নাইল নামের একটা ষাটফুটি জাহাজে তোলা হয়ে গেল সমস্ত ট্রেজার। ব্লু-নাইলের গতি ঘন্টার ৪০ নট। সুয়েজ পাড়ি দিতেই চারঘন্টা লেগে যাবে। বিপদ কখন আসবে জানা নেই। ব্লু-নাইলে এক সপ্তাহ চলার মত পর্যাপ্ত রসদের পাশাপাশি নেয়া হয়েছে প্রচুর এমিউনিশন। জাহাজ ছাড়ার আগে সবাইকে ব্রিজে একত্রিত করল সাইফ। দায়িত্ব আগে থেকেই ঠিক করা। ইঞ্জিনের দায়িত্বে থাকবে সেনাবাহিনির সাবেক প্রকৌশলী বাদরু আজিজি। হুইল হাউস মূলত সাইফের হাতে থাকলেও অন্যরাও সাহায্য করবে ওকে। নাইলের সিকিউরিটির সবাইকে জাহাজ সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান রাখতে হয়। সুমাইয়া বাদে সবাই জাহাজ চালাতে পারে।

'রুটপ্ল্যান আগেই বলা হয়েছে তবুও আরেকবার বলে নেয়া যাক,' শুরু করল

সাইফ, 'আমরা সুয়েজ পার হয়ে ভারত মহাসাগর হয়ে সোজা পোর্ট অফ কলম্বোয় গিয়ে থামব। ওখান থেকে রিফিউলিং করে পতেঙ্গা। এখান থেকে কলম্বো ৩৬৯৫ নটিক্যাল মাইল। চব্বিশ ঘন্টা চলার উপর থাকলেও পৌঁছতে প্রায় চারদিন লেগে যাবে। দায়িত্ব তো ভাগ করাই আছে, সবাই যার যার অবস্থানে চলে যান। আপনাদেরকে চোখ-কান খোলা রাখার কথা বলাটা বাহুল্য। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আমাকে ইনফর্ম করবেন। বেস্ট অফ লাক।' ছোট্ট বক্তৃতা শেষ করল সাইফ।

সুমাইয়া ছাড়া সবাই চলে গেল ব্রিজ ছেড়ে। সুমাইয়া এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'আমাকে কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়নি।'

'উমম, আপনি এক কাজ করুন। সবার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করুন। আপনার দায়িত্ব আপাতত এটাই।' গোমড়া মুখে বিদায় নিল সুমাইয়া। দায়িত্ব মোটেও পছন্দ হয়নি তার!

দীর্ঘ একটা হুইসেল দিয়ে ধীরে ধীরে জেটি ছেড়ে বেরিয়ে এল ব্লু-নাইল। রাজকীয় ভঙ্গি নিয়ে চলতে শুরু করল। পেছনে সাদা ফেনার রেখা চিহ্ন হিসেবে রেখে যাচ্ছে। দশ মিনিট পর গতি উঠল ৩০ নটে। ঠিক সেই মুহূর্তে জেটি ছাড়ল শাইলকের সী-গালও। সী-গালের গতি ব্লু-নাইলের চাইতেই বেশি। আকারে কিছুটা ছোট। চাইলে যেকোনো মুহূর্তেই সাইফদের ধরে ফেলতে পারে কিন্তু এখনই সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই শাইলকের। সুয়েজে যুদ্ধজাহাজের আনাগোনা থাকে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় বের হবার আগে একশনে যাবে না শাইলক। আপাতত শুধু অনুসরণ। রাডারের সাহায্যে খুব ভালভাবেই সেটা করা যাচ্ছে। সাইফের রাডারেরও নজর এড়ায়নি সী-গাল। স্ক্রিনে অনেকগুলো জাহাজ দেখা গেলেও ব্লু-নাইলের দশ মিনিটের মধ্যে এই জাহাজটার জেটি ত্যাগ শুভ কিছু বোঝাচ্ছে না। মাঝে ১ কি.মি. ব্যবধান রেখে ছুটে চলল দুটি জলযান।

প্রায় সাড়ে তিনঘন্টা পর খোলা সমুদ্রে বেরিয়ে এল বোটদুটো। মাস্টারকে নির্দেশ দিল গতি বাড়িয়ে ব্লু-নাইলের কাছে যাবার

ইটস শো টাইম! বিড়বিড় করল শাইলক।

সাইফ লক্ষ্য করল সন্দেহজনক বিন্দুটার গতি বেড়ে গেছে। এগিয়ে আসছে দ্রুত। সাইফ সর্বোচ্চ গতি তুলল। সাথে সাথেই উপলব্ধি করল গতির দৌড়ে ওটাকে হারাতে পারবে না। ওটার গতি ব্লু-নাইলের চাইতে বেশি। ওয়াকিটকিটা তুলে নিয়ে খবরটা জানাল সবাইকে। যাওবা ছিল এতক্ষণ, এখন আর এতটুকু সন্দেহ নেই, মোসাদ অন একশন!

অনেক কাছে চলে এসেছে পেছনের বোটটা। খালি চোখেও ওটার বাতি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ খড়খড় করে উঠল বোটের রেডিওটা। ওপাশ থেকে যান্ত্রিক কিন্তু ভরাট একটা কন্ঠস্বর ভেসে এল।

'দিস ইজ শাইলক। সাইফ হাসান, আশা করি ভূমিকা করে বলতে হবে না কিছু। বোট থামাও, আমরা উঠব।'

'মি. শাইলক, কষ্ট করে একটু দেখবে আমার বোটের নাম ব্লু-নাইলই আছে নাকি বদলে শশুড়বাড়ি হয়ে গেছে!'

'হা হা হা, ভালই রসিক আছো তুমি! কিন্ত মুশকিল হল রসিকতা করার পজিশনে তুমি নেই, সাইফ হাসান।' শেষের দিকে কঠোর হয়ে উঠল শাইলকের কন্ঠ। 'তোমাকে একটা সুযোগ দিতে পারি। ট্রেজার আমাদের দিয়ে দিলে তোমাদের চলে যাবার একটা সুযোগ দেব। জানি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। তবে আমি কিরা-কসম করতে পারব না বিশ্বাস করাবার জন্য!'

'ছিঃ ছিঃ! কসম করতে হবে কেন? তোমার কথাই আমার কাছে ধ্রুব!'

'চালবাজি বন্ধ করে কাজের কথায় এসো, সাইফ। সিদ্ধান্ত নাও, ট্রেজার হারাবে

নাকি প্রাণ?'

'দুঃখিত, আমি কোনোটাতেই রাজি না।'

'দশ মিনিট সময় দিলাম। এরমধ্যে জাহাজ না থামালে বুলেট কথা বলবে। এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি চাইব প্রথম বুলেটটা তোমার মগজে ঢুকুক।' সাইফকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই লাইন কেটে দিল শাইলক। নিস্তব্ধতা নেমে এল ব্লু-নাইলের ব্রিজে। শুধু সাগরের হু হু আওয়াজ।

রেডিওটা নীরব হয়ে যেতেই সাইফ ভয়েস পাইপের মাধ্যমে সবাইকে ব্রিজে আসতে আদেশ করল। একে একে সবাই এসে উপস্থিত হল ব্লু-নাইলের মাস্টার ব্রিজে। হাতে একটা সেকেন্ডও বাড়তি নেই, কাজের কথায় চলে এল সাইফ।

‘মোসাদ আমাদের বিশ মিনিট সময় দিয়েছে, এরপরই অ্যাকশনে যাবে। ওদের ম্যান ও আর্মস পাওয়ার আমাদের চাইতে বেশি। আই হ্যাভ আ প্ল্যান।’ সাইফ এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট জাহী হামাদির দিকে ফিরল, ‘শক্তিশালী একটা বোমা ডেটোনেটরসহ বানাতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?’

‘দশ মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে আশা করি।’

‘আশা করি না, দশ মিনিটের মধ্যে বোমাটা আমার চাই। তুমি কাজে লেগে পড়ো।’ বাকিদের দিকে ফিরল সাইফ, ‘প্ল্যান বিস্তারিত বলার সময় নেই। এখন যা বলব শুধু সেটাই ফলো করবেন। আমি যখন লম্বা করে হুইসেল বাজাব তখন আকিল ছাড়া সবাই জাহাজ থেকে নেমে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাবেন। এখনই গিয়ে লাইফ জ্যাকেট পরে তৈরি হয়ে নিন।’

মনে গাদাখানেক প্রশ্ন জমে থাকলেও আকিল ছাড়া সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে নেমে গেল নিচে। সাইফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সী-গাল ছাড়াও রাডারে কী একটা খুঁজছে।

দশ মিনিট পেরোবার আগেই জাহী হামাদি উঠে এল নিচ থেকে। হাতে ধরা সদ্যজাত এক্সপ্লোসিভ।

সাইফ রেডিওটা অফ করে দিল। জাহীর দিকে ফিরে বলল, 'তুমি এখন নিচে গিয়ে দুটো লাইফ জ্যাকেট আর দুটো AK-47 নিয়ে আসবে, নিজেও পরে ফেলবে। এরপর আমি যখনই হুইসেল বাজাব তখন বোমাটা একটিভেট করে অন্য সবার সাথে তুমিও পানিতে লাফ দেবে। যতটা সম্ভব সবাইকে নিয়ে দূরে সরে যাবে জাহাজ থেকে। আমি আর আকিল তোমাদের কাভার দেব এসময়টাতে। আমরা দু' জন জাহাজ ছাড়ব বিস্ফোরণের ত্রিশ সেকেন্ড আগে। কোনো প্রশ্ন?'

আকিল মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল তার কোনো প্রশ্ন নেই।

'বস, বোমাটা অনেক শক্তিশালী,' জাহী হামাদি বলে উঠল। 'সময়মত জাহাজ ছাড়তে না পারলে কিন্তু...' বাকিটা উহ্য রাখল।

সাইফ মুচকি হাসল শুধু জবাবে।

জাহী বুঝতে পারল এই লোকটা ভাল রকম ত্যাড়া, কথা শুনবে না!

কিছুক্ষণ বাদেই একজোড়া অস্ত্র আর লাইফ জ্যাকেট হাতে ফিরে এল জাহী। ওগুলো হাত বদল হতেই সে নিচে নেমে গেল। একটা অস্ত্র আর লাইফ জ্যাকেট আকিলের দিকে বাড়িয়ে ধরল সাইফ।

'আপনি জাহাজের পেছনে চলে যান। বাকিদের কাভার দেবেন। ঘড়ি ধরে ঠিক ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় যাই ঘটুক না কেন আপনি জাহাজ ছাড়বেন, এই রিপিট, যাই ঘটুক না কেন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?'

আকিল নীরবে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

রেডিওটা চালু করে দিল সাইফ, প্রায় সাথে সাথেই জ্যান্ত হয়ে উঠল ওটা।

'কী সিদ্ধান্ত নিলে সাইফ?' শাইলকের নিস্পৃহ গলা শোনা গেল।

'এখনও নিতে পারিনি। আর কিছুটা সময় দেয়া যাবে?'

‘আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি একটা চালাকি করতে চাইছ। তা কতক্ষণ লাগবে তোমার?’

রাডারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সাইফের কপালের চিন্তার রেখাটা মিলিয়ে গেল। রেডিওর কাছে মুখ নিয়ে বলল, ‘এই ধরো, আরো বছর পঞ্চাশেক!’

ওপাশে শাইলকের জবান বন্ধ হয়ে গেছে। রাগে কয়েক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারল না সে। নিজের উপর পুর্ণমাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই সে এতদিন ভাবত। কিন্তু এই সাইফ ছোকড়া ওকে রাগিয়ে দিতে পারছে, আর এটা ভেবেই আরো বেশি করে রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়।

ওপাশে নীরবতা নেমে এল। হুইল হাউসে শুধু সাইফ একা। বিপদের আশংকায় স্নায়ু টান টান। হঠাৎ সী-গালের সবগুলো বাতি একসাথে নিভে যেতে দেখেই সাইফের বুকের রক্ত ছলকে উঠল। এক ঝটকায় ও নিজেও ব্লু-নাইলের মেইন সুইচ অফ করে দিল, জাহজটাও থামিয়ে দিল একই সাথে। নাইল ডুব দিল আঁধারে। সাথে সাথেই ফায়ার ওপেন হল সীগাল থেকে। হুইসেল চেপে ধরল সাইফ। গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে হুইসেলের গুরুগম্ভীর আওয়াজে কেঁপে উঠল ব্লু-নাইল। নরক ভেঙে পড়ল যেন সাগরে। একযোগে গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। মৌমাছির মত বিঙঙ আওয়াজ করে বুলেট ঢুকে পড়তে লাগল ব্লু-নাইলের হুইল হাউসে। সাইফ এক নজরে ব্লু-নাইলের ডান পাশটা দেখে নিল। আবছা আঁধারেও বুঝতে পারল ওর নির্দেশ অনুযায়ী সবাই নেমে পড়েছে সাগরে। যদিও সী-গাল ব্লু-নাইলের বাম পাশে থাকায় দেখতে পাচ্ছে না তাদের।

এবার ফায়ার ওপেন করল সাইফ। পেছন থেকে আকিল আরো আগেই ওপেন করেছে। এপাশ থেকেও সমানতালে জবাব দিতে লাগল দুটো রাইফেল। বারুদের গন্ধে রক্তে বান ডাকল সাইফের। দীর্ঘদিন পর পুরনো সেই উত্তেজনা

অনুভব করছে যার লোভেই আর্মিতে যোগ দিয়েছিল ও।

দুটো জাহাজই মাঝ সমুদ্রে থেমে আছে। গোলাগুলি শুরু হতেই সাইফ ব্লু-নাইল থামিয়ে দিয়েছে। ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালের দিকে তাকাল সাইফ। তেইশ সেকেন্ড পার হয়ে গেছে বোমা একটিভেট করার পর থেকে। আর সাইত্রিশ সেকেন্ড পর স্রেফ ধুলোয় পরিণত হবে ব্লু-নাইল।

হাতের অস্ত্রটা খালি করে ফেলল সাইফ। জাহাজ ছাড়ার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছ এমন সময় ব্লু-নাইলের পেছনের অংশ থেকে গুলি বন্ধ হয়ে গেল। সাইফের বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। আকিলের তো এখনই নেমে যাবার কথা না। সময়ের চুলচেরা হিসেবে গড়মিল করবে না আকিলের মত একজন সাবেক আর্মিম্যান। সেক্ষেত্রে একটি সম্ভাবনাই থাকে- গুলি খেয়েছে আকিল। ঘড়ির দিকে তাকাতেই সাইফের দিশেহারা ভাবটা বেড়ে গেল। আর ত্রিশ সেকেন্ডও নেই।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল সাইফের। ব্লু-নাইলের কন্ট্রোল অটো থেকে ম্যানুয়ালে নিয়ে এল। সী-গালের দিকে তাক করল ব্লু-নাইলের গলুই। সামনের গ্লাস আগেই চুর চুর হয়েছে ফাঁক দিয়ে ছুটে আসা একটা বুলেটের আঘাতে এবার কন্ট্রোল প্যানেলের একটা অংশ চুরমার হয়ে গেল। তবে রক্ষে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু নষ্ট হয়নি। থ্রটল পুরোপুরি খুলে দিল সাইফ। সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ব্লু-নাইল ছুটল সী-গালের দিকে। মাঝখানে প্রায় সত্তর গজের মত ব্যবধান। মাপতে গেল না সাইফ। ব্লু-নাইলকে ছুটিয়ে দিয়ে সী-গাল থেকে ছুটে আসা বুলেটকে সম্পুর্ণ অগ্রাহ্য করে নিজেও ছুটল জাহাজের পেছন দিকে।

আকিলকে পড়ে থাকতে দেখা গেল রেলিং-এ হেলান দিয়ে। অচেতন। বেঁচে আছে না মরে গেছে দেখার মত কয়েকটা সেকেন্ডও সাইফের হাতে নেই। আর মাত্র বিশ সেকেন্ড। দুটো জাহাজের ব্যবধানও কমে এসেছে অনেকটা। যেকোনো মুহূর্তেই সংঘর্ষ ঘটবে। আকিলকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল

সাইফ। মারাত্মক ভারী লোকটা। দুটো জাহাজের সংঘর্ষের ঠিক আগ মুহূর্তে জাহাজ থেকে লাফ দিল সাইফ। ও শূন্যে থাকা অবস্থাই ব্লু-নাইল গিয়ে ধাক্কা মারল সী-গালের পেটে।

সী-গালের মাস্টার কল্পনাও করতে পারেনি ব্লু-নাইল থেকে এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ষাটফুটি জাহাজকে সে আসতে দেখল বটে কিন্তু সময়মত সরিয়ে নেবার সুযোগটা পেল না। ব্লু-নাইল প্রচন্ড গতি নিয়ে ধাক্কা মারল চল্লিশ ফুটি সী-গালকে। প্রচন্ড ঝটকায় ভুমি শয্যা নিল সী-গালের সবাই। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল। ব্লু-নাইল যেন তবু অপ্রতিরোধ্য। সী-গালকে তখনও ঠেলে নিয়ে চলছে, সংঘর্ষের ফলে গতি কমে গেছে অনেকটাই। প্রথম ধাক্কায়ই ইউরি কোলম্যান পানিতে পড়ে যায়। চলমান সী-গাল কয়েক টন ওজন নিয়ে উঠে পড়ল তার মাথায়। আক্ষরিক অর্থেই চূর্ণ হয়ে গেল মাথাটা।

এদিকে সাইফ আকিলকে জড়িয়ে ধরে প্রাণপনে দূরে সরে যেতে চাইছে জড়াজড়ি করে থাকা জাহাজ দুটো থেকে। আর মাত্র পাঁচ সেকেন্ড।

সী-গালের আর সবার মত শাইলকও মাটিতে পড়ে গেছে। বুঝতে পারছে কোথাও একটা গড়বড় হয়ে গেছে। সাইফের কাছে হেরে গেছে সে। উঠে দাঁড়াতে শুরু করল, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের প্রথম ধাক্কাতেই মারা পড়ল সী-গালের বেশিরভাগ আরোহী। যাদের মধ্যে শাইলকও রয়েছে। শত টুকরো হয়ে তার দেহটা ছড়িয়ে পড়ল সাগরের অশান্ত পানিতে। ব্লু-নাইল থেকে বেরিয়ে আসা লেলিহান শিখা এবার গ্রাস করল সী-গালকে।

মরিয়া হয়ে সাঁতরাতে থাকা সাইফ শকওয়েভের ফলে সৃষ্ট বিরাট ঢেউয়ের ধাক্কায় পুতুলের মত অনেকটা সামনে চলে গেল। ডুবছে আর ভাসছে। বিষের মত লবণাক্ত পানি পেটে যেতেই কেশে উঠল। তখনও অচেতন আকিলকে ছাড়েনি। হাতের পেশি অসার হয়ে আসতে চাইছে। চারপাশটা মশালে পরিণত হওয়া দুই জাহাজের আলোয় দিনের মতই উজ্বল। সেই আলোতে বাকি

সঙ্গীদের দেখতে পেল সাইফ। ঢেউটা কমে আসতেই এগোতে শুরু করল ওদের দিকে। আকিলের দায়িত্ব অন্য কারো হাতে না দিলে লোকটাকে আর ভাসিয়ে রাখতে পারবে না।

ঠিক তখনই ভোজবাজির মতই উদয় হল দুটো স্পিডবোট। সবাই হলফ করে বলতে পারবে এক মিনিট আগেও কেউ দেখেনি ওগুলো।

* * *

বিলাসবহুল ইয়টের হুইল হাউসে বসে কফি খাচ্ছে সাইফ। শান্ত ভঙ্গি দেখে বোঝার উপায় নেই একটু আগে কী ঘটে গেছে ওর উপর দিয়ে। পোর্টহোল দিয়ে সাগর দেখছে।

আকিলকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। তেমন গুরুতর নয় আঘাতটা। কেবিনে উপস্থিত বাকি সবাই মুখ গোমড়া করে বসে আছে। সুমাইয়ার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কেঁদেই ফেলবে। মনে অনেক প্রশ্ন জমে থাকলেও করার মত মানসিক অবস্থা নেই ওদের। কিছুক্ষণ আগেই ট্রেজার ভর্তি ছয়টা বাক্স বিসর্জন দিয়ে এসে থাকার কথাও না।

ইয়টটা আলী আহমাদের। স্পিডবোটদুটো ওদের নিয়ে এসেছে এখানে। মালিক স্বয়ং ইয়টে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানিয়েছেন ওদের। ইয়টটা এখন ফিরে যাচ্ছে পোর্ট সাঈদে।

‘সবাই এমন গোমড়া মুখে বসে আছেন কেন?’ সাইফ সমুদ্র থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল।

‘ছয়টা ট্রেজারের বাক্স সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আমার অন্তত খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে না।’

‘সমুদ্রে সেঁচে যদি ওগুলো উদ্ধার করে আনি তাহলে নাচবেন?’

সুমাইয়া কটমট করে তাকাল সাইফের দিকে।

‘ওকে গাইজ, একটা ব্যাখ্যা আপনাদের পাওনা হয়েছে। সবার আগে বলে নেই, ট্রেজার আমরা হারাইনি। ওটা এখন বাংলাদেশের পথে।’

কেবিনে মিসাইল এটাক হলেও কেউ এতটা অবাক হত না। বিস্ময়ের আতিশয্যে কেউ কথাই বলতে পারল না। সাইফকেই আবার শুরু করতে হল।

‘পুরো ব্যাপারটাই ছিল একটা প্ল্যান। ট্রেজার নিরাপদে মিশর থেকে বের করে নিয়ে যাবার জন্য একটা ডাইভার্শনের প্রয়োজন ছিল। ট্রেজার পাবার কিছুক্ষণ পরই আমি কর্ণেল আজহার চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করে তাকে একটা টিম পাঠাতে বলি। কর্ণেল ছয়জনের একটা টিম পাঠান। তারা এসে পৌঁছায় গতকাল বিকেলে। এদিকে মোসাদ নিজেই নিজেদের ঘোল খাবার ব্যবস্থা আমার হাতে তুলে দেয় আমার রুমে বাগ বসিয়ে। আমি তাদের জানিয়ে দেই ট্রেজার বের হবে আজ। ওরা নিশ্চিন্তে আমার উপর নজর রেখে আজকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, ওদিকে গতকাল রাতেই ট্রেজার বাংলাদেশের পথে রওনা হয়ে যায়। গতকালের মিশনটার দায়িত্ব ছিল আকিলের উপর। আপনাদের মধ্যে একমাত্র সেই-ই জানত পুরো ব্যাপারটা।

ট্রেজার তো বের করা গেল কিন্তু মোসাদ তো আমাকে এত সহজে বের হতে দেবে না। মোসাদের বিষদাঁত-সাময়িক সময়ের জন্য হলেও- ভেঙে দেবার জন্যই আজকের এই আয়োজন। আলী আহমাদকে ব্যাকআপ হিসেবে রেখেই পুরো সেটআপটা সাজাই। ঝুঁকিটা বেশিই নেয়া হয়ে গেছে তবে আপনাদের উপর আমার আস্থা ছিল। আপনাদের জানাইনি তাতে হয়ত সতর্কতায় ঢিল পড়ত। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।’ সাইফ লজ্জিত একটা হাসি নিয়ে তাকাল সবার দিকে। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটতে সময় লাগছে ওদের। তবে সাইফের হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে একে একে সবার মুখেই হাসি সংক্রামিত হল।

সুমাইয়ার দিকে তাকাল এবার সাইফ।

‘কি, এখন নিশ্চয়ই নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে?’

সুমাইয়া জবাব দেবার আগেই সম্মিলিত অট্টহাসির আওয়াজ বাতাসে চেপে ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রে।

সাইফ মুচকি হেসে আবার তাকাল অসীম সমুদ্রের দিকে। তর তর করে এগিয়ে চলেছে ওদের জলযান।

(সমাপ্ত)

Ebook Created by: Bangla Epub & Mobi Creator Team (fb group)

Table of Contents

কাহিনী সংক্ষেপঃ

এক

দুই

তিন

চার

পাঁচ

ছয়

সাত

আট

নয়

দশ

এগারো

বারো

তেরো

চোদ্দ

পনেরো

ষোল

সতেরো

আঠারো